

রাজশাহীতে ইসলাম



ডঃ এ কে এম ইয়াকুব আলী

প্রফেসর

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

রাজশাহীতে ইসলাম ঃ
ডঃ এ কে এম ইয়াকুব আলী
ইফাবা গবেষণা ঃ ১১
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭২০
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৯৫৪৯২
ISBN : 984-06-0072-9

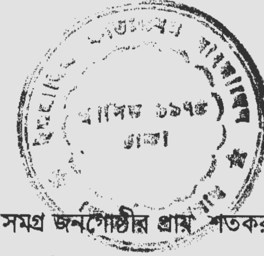
প্রকাশকাল
অগ্রহায়ণ ১৩৯৯
জমাদিউসসানি ১৪১৩
ডিসেম্বর ১৯৯২

প্রকাশনায়
এম. আতাউর রহমান
পরিচালক,
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রিন্টিং প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা মাত্র

RAJSHAHITE ISLAM (Islam in Rajshahi) : Written in Bengali by Dr A K M Yaqub Ali and published by Department of Research, the Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka.
Price : TK. 60.00 only
U. S. Dollar : 3.00
ISBN: 984-06-0072-9



প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই মুসলমান ; তাই ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-সভ্যতা শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাব জনজীবনেও এত বেশি। ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের শিকড় এ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর অনেক গভীরে প্রোথিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বকীয় বৈশিষ্টের ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতিসত্তা স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল । দেশের হাজার হাজার মসজিদ ও মাযার এবং অন্যান্য প্রাচীন পুরাকীর্তি বাংলাদেশী মুসলমানদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক সত্তার সাক্ষী হিসেবে ছড়িয়ে আছে আমাদের শহর, নগর ও গ্রামগঞ্জে।

জাতি হিসেবে নিজের সত্যিকার পরিচয় জানা আমাদের সকলের কর্তব্য। কিভাবে এ দেশের শতকরা ৯০ জন লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে তা অবহিত হওয়া আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে 'বিভিন্ন জেলায় ইসলাম' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আওতায় কয়েকটি জেলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি সেই কার্যক্রমেরই একটি অংশ । বলা আবশ্যক এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসও সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

ইয়াকুব আলী তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে 'রাজশাহীতে ইসলাম' গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন । এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের মূল শক্তি সূফি-দরবেশ, ওলামায়ে কিরামের কর্মতৎপরতা ও আত্মত্যাগী ভূমিকাকে তিনি তাঁর গ্রন্থে তথ্য সম্বলিত করে তুলে ধরেছেন । আশা করি গ্রন্থটি সর্বশ্রেণীর পাঠকের বেশ উপকারে আসবে ।

এম. আতাউর রহমান
পরিচালক,গবেষণা

ভূমিকা

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ্ পাক কুরআন মজীদে এমন এক শ্রেণীর লোককে উত্তম জাতি হিসেবে অভিহিত করেছেন যারা জনগণকে মহৎ কাজের দিকে আহবান করবে, সৎকর্মের আদেশ প্রদান এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ্ পাক এসব লেকের সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। মহানবী (সা) তাঁর বাণীকে একটি বাক্য পরিমাণ হলেও অপরের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। আল্লাহ্র ওহী এবং রসূলের হাদীস মুসলমানদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। মহানবী (সা)-এর প্রতিটি সাহাবা ইসলামের প্রচারকে জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা যদি নিঃস্বার্থভাবে ইসলাম প্রচারের জন্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত না করতেন তা হলে ইসলাম আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতো এবং বিশ্বের দিগ্‌দিগন্তে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হতো না। এসব মরদ-ই-মুজাহিদের অবিরাম প্রচেষ্টার কারণে মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের মাত্র এক শতব্দীর মধ্যে অর্ধগোলার্ধে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচারের ধারা অনুরূপভাবে অব্যাহত ছিল এবং উলামা, মাশায়েখ এবং সূফী-সাধকগণের নিরলস প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশে ইসলাম জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। ইসলাম কেবলমাত্র একটি ধর্ম মাত্র নয়, বরং এটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মুসলিম শাসকগণ এই সত্যটি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে মহানবী (সা)-এর অনুকরণে শরীয়তের বিধানকে সমাজ জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে উলামা, মাশায়েখ এবং প্রচারকগণ ইসলামের শান্তির অমীয়বাণীকে জনগণের নিকট উপস্থাপিত করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, আল্লাহ্ পাকের আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য মহানবী (সা) সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং ওহী ও রিসালাতের মাধ্যমে সে সব তাঁর নিকট প্রেরিত হয়েছে। মহানবী (সা)-এর পরে আর ওহী আসবে না, কিন্তু রিসালতের ফল্গুধারা খিলাফতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাঙ্ক্ষিত পথে প্রতিনিধিত্বমূলক সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হচ্ছে

খিলাফত। এটি এক অবিভাজ্য ঐশী বিধান এবং এই খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানটি মুসলমান জাহানের ঐক্যের প্রতীক। ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং তার নির্দেশাবলীর পুরোপুরি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল খিলাফতের উপর। পরবর্তীকালে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উলামা, মশায়েখ এবং সূফী-সাধকগণ ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কারণ তখন ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় এককভাবে খিলাফতের পক্ষে এসব দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এই পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে উলামা, মাশায়েখ এবং সূফী-সাধকগণ

এককভাবে অথবা রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় যৌথভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন।

বাংলায় ইসলাম প্রচার এই ধারার পর্যায়ভুক্ত। বিভিন্ন উৎস পর্যালোচনা করে বলা যায় যে; ঈসায়ী নবম ও দশম শতাব্দী থেকে বাংলার সাথে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা ইসলাম প্রচারের সূত্রে স্থাপিত হয়েছিল। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গাযী ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে তুর্কী মুসলমানগণ কর্তৃক এ দেশ বিজিত হওয়ার ফলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এক নব যুগের সূচনা হয়। এ দেশে উলামা, মাশায়েখ এবং সূফী-সাধকগণের আগমন বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ইসলাম এ দেশের গণমানসে স্থায়ী আসন করে নেয়। বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে ও জেলার ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগৃহীত হলে আমরা সামগ্রিক বাংলায় ইসলাম প্রচারের ধারা ও কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ জেলা ভিত্তিক ইসলাম প্রচারের ইতিহাস রচনার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর আঠারটি জেলার ইসলাম প্রচারের ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচিত ও লিপিবদ্ধ হলে তা গবেষণার রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করবে এবং জ্ঞানকোষে নতুন উপাত্ত ও তথ্যের সংযোজন ঘটাবে বলে আমরা আশাবাদী। রাজশাহীতে ইসলাম এই পরিকল্পনার একটি অংশ।

রাজশাহী বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য জেলা। এই জেলায় চারটি মহকুমা ছিল। এ সবের নাম--রাজশাহী সদর, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ। ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে এসব মহকুমা পর্যায়ক্রমে জেলাতে রূপান্তরিত হয়। এখানে রাজশাহী বলতে বৃহত্তর রাজশাহী জেলাকে নির্দেশ করা হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে রাজশাহী জেলার সৃষ্টি হলেও এই স্থানের প্রাচীনতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে পুরাকীর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তা থেকে আমরা এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারি। পুণ্ড্র এ দেশের একটি প্রাচীন জনপদ এবং তা থেকে বরেন্দ্র জনপদ গঠিত হয়। প্রাচীনকালের পুণ্ড্র, বরেন্দ্র ও রাজা গণেশের জমিদারি ভাতুরিয়া পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে বর্তমান রাজশাহী জেলার প্রতিনিধিত্ব করে। পুরাভূমি হওয়ার কারণে এই অঞ্চলেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছে, রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর রূপরেখা তৈরি হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন স্রোত থেকে প্রবাহিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির বালিয়াড়ি জমেছে এবং পরিশেষে সেগুলো ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার উপকরণ হয়ে বাংলার ইতিহাস, সমাজ ও সভ্যতার পুনর্গঠনে মৌলিক অবদান রাখতে সহয়তা করেছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে বাংলার জেলা গঠন এবং রাজশাহী জেলার আয়তন ও পরিসীমা সম্পর্কে কিছু বলার অবকাশ আছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হতে কোম্পানী শাসন আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং প্রশাসন ও বিচারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে বিভিন্ন জেলায় বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস করতে প্রয়াসী হয়। মুঘল আমলের চাকলা রাজশাহী যার বিস্তৃতি পদ্মা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত ছিল তা হতে পদ্মার দক্ষিণ অংশ কেটে নিয়ে অন্য জেলা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ার ফলে জেলার পরিসীমাকে আরও ছোট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সে জন্যে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রহনপুর এবং চাঁপাই থানাদ্বয়কে রাজশাহী হতে পৃথক করে দিনাজপুর ও পুর্নিয়ার সাথে যোগ করে দিয়ে আলাদা জেলা সৃষ্টি করা হয়। এরপর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আদমদিঘী, নওখিলা, শেরপুর ও বগুড়া থানাগুলোকে রাজশাহী হতে পৃথক করা হয় এবং সে সবের সাথে রংপুরের দু'টি থানা ও দিনাজপুরের তিনটি থানাকে যোগ দিয়ে বগুড়া জেলা গঠন করা হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীর পাঁচটি থানা-শাহজাদপুর, খেতুপাড়া, রায়গঞ্জ, মাথুরা

ও পাবনা এবং যশোরের চারটি থানা আলাদা করে নিয়ে পাবনা জেলা গঠিত হয়। এভাবে বাংলার উত্তরাঞ্চলের জেলার পুনর্বিন্যাস সাধিত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, কোম্পানী শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে রাজশাহী জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। প্রশাসনের সুবিধার জন্য ক্রমান্বয়ে এটির পরিধি সংকুচিত করে অন্য জেলার সৃষ্টি করা হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহী জেলার সদর দফতর ছিল নাটোর। কিন্তু উক্ত স্থানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে রাজশাহীর তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ জি. এ. প্রিংগালের রিপোর্টের ভিত্তিতে নাটোর হতে সদর দফতর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। এ বছর থেকে বর্তমান রাজশাহী জেলার প্রকৃত উৎপত্তি বিবেচনা করা যায়। তবে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ বিভাগের ফলে মালদহের চাঁপাইনবাবগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তানের (পরিবর্তীতে বাংলাদেশের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে রাজশাহী জেলার পরিসীমাকে বর্ধিত করেছে। আমাদের আলোচনা রাজশাহী জেলার এই আয়তন ও পরিসীমাকে কেন্দ্র করে হবে।

ভৌগোলিক দিক হতে রাজশাহী জেলা উঁচু ও পুরাভূমির অন্তর্ভুক্ত। এ জেলার কর্ষণযোগ্য ভূমি অতি উর্বর এবং তা বিভিন্ন প্রকৃতির ফসল উৎপাদনের জন্যে উপযোগী। ধান, পাট, গম, ইক্ষু ও সরিষা এ জেলার অর্থকরী ফসল। এ জেলার উৎপাদিত শস্য ধান তার অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাংলাদেশের অন্যত্র সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ঈসায়ী সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন এই অঞ্চল অতিক্রম করেন তখন বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য শস্য ও ফল উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ও দূতগণ পাণ্ডুয়ার মুসলিম রাজদরবারে যাত্রাকালে এই অঞ্চলের ফসল উৎপাদনের আধিক্য এবং জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবারণ দান করেছেন। মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারী ঐতিহাসিক আবুল ফজল বছরে তিনবার এবং কমপক্ষে দু'বার এ অঞ্চলের ভূমিতে প্রধান খাদ্যশস্য ধান উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন। এই জেলার বিভিন্ন স্থানের জমিতে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু উৎপাদিত হতো এবং তা থেকে উত্তম জাতের চিনি প্রস্তুত হতো। কেবলমাত্র এই জেলার নয়, বরং এ দেশের চাহিদা মেটানোর পর তা সমুদ্র বন্দর দিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হতো। তুঁতগাছ থেকে রেশম তৈরি করা হতো এবং তা থেকে রেশমী কাপড় প্রস্তুত করা হতো। এসব অর্থকরী ফসল এ জেলার অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করে রেখেছিল।

প্রাক-মুসলিম যুগে এ জেলার অধিভুক্ত স্থানসমূহে প্রশাসনিক ইউনিট গড়ে উঠেছিল। এ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে পাল ও সেন যুগের যেসব তাম্র শাসন ও পট্টলী সংগৃহীত হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, শাসকগণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ সাধিত হয়েছিল এবং পাল শাসকগণ বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের সংস্কৃতির প্রসারের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। রাজশাহী জেলার পহাড়পুরের সোমাপুরা বিহার এর সাক্ষ্য বহন করে। সেন আমল ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ হিন্দুদের প্রতিষ্ঠার যুগ। সেন শাসকদের শ্রেণী ও বর্ণ বিন্যাস প্রথা হিন্দু জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করে দেয়। এ যুগের তাম্র শাসন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণদের দেব মন্দির ও ধর্মশালা পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিষ্কর ভূমি দান করা হত । রাজশাহী জেলায় এরূপ ভূমি দানের সংখ্যা কম নয়। সেনদের ব্রাহ্মণ্যবাদ শাসনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছিল নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ। প্রশাসন ব্যবস্থা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং সমাজ জীবন অবক্ষয়ের শেষ ধাপে পৌঁছেছিল। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা দারিদ্র্য সীমার অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল। সমাজ জীবনের এই প্রেক্ষাপটে বিজয়ীবেশে তুর্কী মুসলমানদরে আগমন ঘটেছিল বাংলার এই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমিতে। তাঁদের উন্নত সংস্কৃতি ও নতুন জীবনবোধের সাথে বিজিত অঞ্চলের লোকদের পরিচয় ঘটে । ক্রমান্বয়ে তারা তা গ্রহণ করে সমাজ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তন আনয়ন করতে সক্ষম হয়।

বাংলায় মুসলিম শাসনকে আমরা দুটি প্রধান যুগ বা পর্যায়ে বিন্যাস করতে পারি। একটি সুলতানী যুগ এবং অপরটি মুঘল যুগ। তুর্কী বীর গাযী ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার লাখনাবতী রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হয়। এ সময় থেকে শুরু করে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত সুলতানী যুগ হিসেবে গণ্য হয়।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় মুঘল ও নবাবী শাসনের যুগ গণ্য করা হয়। রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে সুলতানী ও মুঘল যুগের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। মুসলিম বিজয়ের প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রশাসনের সুবিধার জন্য বিজিত অঞ্চলকে বেশ কিছু ইক্‌তা বা প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে। এসবের মধ্যে মাহিসন্তষ ও নারকুটি উল্লেখযোগ্য। রাজশাহী জেলার মাহিসন্তষ ও নাটোরকে যথাক্রমে উপরের দুটি ইক্‌তার সাথে অভিন্ন মনে করা হয়। সুলতানী আমলের বারবকাবাদ টাঁকশাল মাহিসন্তষে স্থাপিত হয় এবং সে জন্যে স্থানটির নামকরণ হয় বারবকাবাদ। পরবর্তীতে মুঘল শাসনামলে সম্রাট আকবরের সুবা বাংলার একটি সরকার বারবকাবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সুলতানী আমলে প্রশাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গৃহীত হয় এবং রাজশাহী জেলার অধিভুক্ত বেশ কিছু স্থান কৌশলগত দিক থেকে ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজা গণেশের জমিদারি পরগণা ভাতুরিয়া রাজশাহীর এক বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। মুসলিম প্রশাসনকে উৎখাত করার লক্ষ্যে রাজা গণেশ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং বেশ কিছু উলামা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে হত্যা করে। এ পর্যায়ে প্রখ্যাত সূফী-সাধক ও মরদ-ই-মুজাহিদ নূর কুতবুল আলম রাজা গণেশের অশুভ তৎপরতাকে প্রতিহত করা এবং মুসলমানদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করার প্রয়াসে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শরকী তাঁর আমন্ত্রণে রাজা গণেশকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্যে বাংলায় আসেন। কিন্তু নূর কুতবুল আলমের হাতে রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জিতমল ইসলাম গ্রহণ করে জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করায় এখানে দারুল ইসলাম বহাল থাকে এবং ইব্রাহীম শারকীকে স্বদেশে ফিরে যেতে হয়। রাজনীতির এই পট-পরিবর্তনের প্রভাব রাজশাহীর উপরও পড়েছিল বলে অনুমিত হয়। মুঘল সম্রাট শাহজাহান তাঁর পুত্র শাহ সুজাকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তখন প্রশাসনিক কর্মকান্ডে রাজশাহীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শাহ নিয়ামতুল্লাহ যিনি শাহ সুজার আধ্যাত্মিক মুরশিদ ছিলেন এ অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ ও গোদাগাড়ী আন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং বৃটিশ শাসনকাল পর্যন্ত তা অক্ষুন্ন ছিল।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় রাজশাহী জেলায় মুসলিম বিজয়ের পর থেকে উলামা, মাশায়েখ ও সূফী-সাধকগণের আগমন ঘটেছিল, এবং তাঁহাদের নিরলস প্রচেষ্টায় জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সাঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এ ক্ষেত্রে শাহ মখদুম আবদুল কুদ্দুস রূপোশ, মাওলানা শাহ দাওলা, শাহ মুকাররম, শাহ সুলতান ও মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম শাসকগণও ইসলাম প্রচার এবং সে সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহী জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদ্রসা বা শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল এবং উলামা ও শিক্ষকগণকে মদদ-ই-মাশ হিসেবে আয়মা ও লাখেরাজ ভূমি প্রদান করা হয়েছিল। উপরন্তু জেলার বিভিন্ন স্থানে মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এসব মসজিদ দরগাহ্ বা পাঠদান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে মুসলিম সমাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এভাবে মসজিদ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে মুসলিম শাসনামলে এ জেলার সাধারণ জনগণ ইসলামকে জানা ও বোঝার সুযোগ লাভ করেছে। স্থাপত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকগণ এ জেলার গড়ে ওঠা ইমারতে ও শিল্পে-স্বাতন্ত্র্যের ছাপ স্পষ্ট করে প্রতিফলিত করেছেন। বর্তমান শিবগঞ্জ থানাধীন গৌড়ের শহরতলীর ঘোষপুরের দরসবারী মাদ্রাসা, বাঘার মাদ্রাসা এবং মাহিসন্তষে মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা মধ্যযুগে বাংলায় ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও অন্যান্য ব্যবহারিক শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। বাংলার বাহির থেকে শিক্ষার্থীরা এসব মাদ্রসায় এসে শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর পারদর্শীতা লাভ করতেন। ইল্‌ম চর্চার কেন্দ্র হিসেবে রাজশাহীর ছোট সোনা মসজিদ, দরসবারী মসজিদ, বাঘার মসজিদ ও কুসুম্বা মসজিদ মুসলিম শাসনামলে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। এসব মসজিদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্রম চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

রাজশাহী জেলার আলোচ্য ইতিহাসে আধুনিক যুগ ধরা হয় বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভ থেকে। বৃটিশ শাসনামলে মুসলমানরা বৃটিশ শাসনের বৈষম্যমূলক নীতির জন্যে সর্ব

ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েন। তবুও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজশাহীর অতীত গৌরব অনেকাংশে অক্ষুন্ন থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজী ও উচ্চশিক্ষার জন্যে রাজশাহী কলেজ স্থাপিত হয়। এ কলেজ কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের সমমানের ছিল। মুসলমান ছাত্রদের জন্য এ সময়ে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী রাজশাহী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারের জন্য রাজশাহী মাদ্রাসার অবদান অনস্বীকার্য। হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে ইংরেজী শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ছাড়া হিন্দুদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে তাঁরা টোল ও সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মুসলমান বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণও মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে অর্থ ব্যয় করেছেন। রাজশাহীতে এমন কিছু মুসলিম ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা সাইয়েদ আহমদ রায় বেরেলভীর জিহাদ আন্দোলন চলাকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুজাহিদগণের ব্যয়ভার বহনে সহায়তার জন্য এখান থেকে রসদ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। বগুড়া থেকেও অনুরূপভাবে জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিগণ কর্তৃক রসদ সংগৃহীত হয়েছে এবং সেসব সিতানা সীমান্ত ঘাটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রাজশাহী থেকে এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়াস চলেছে। এ জন্যেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়েছে। এই সমিতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে এমন সব বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় অনেক পুরাকীর্তি সংগৃহীত হয়েছে এবং ক্রমানয়ে এসব সংরক্ষণের জন্যে দিঘাপতিয়ার রাজার অর্থানুকূল্যে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীনে রয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস ও সাহিত্যের উপর গবেষণার প্রচুর উপকরণ ও উপাত্ত এখানে সংরক্ষিত আছে।

বৃটিশ শাসনের অবসানের পর ১৯৪৭ সাল থেকে রাজশাহী বিভাগীয় শহর হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে এবং তার উন্নয়নের ধারা অব্যহত থাকে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) রাজশাহীর উন্নয়নের জন্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হয় রাস্তা–ঘাটের সংস্কার সাধিত হয় এবং জনগণের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজশাহীর অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, কারিগরী মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, প্রভৃতি শিক্ষায়তন এ অঞ্চলের জনগণের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করেছে। তা ছাড়া রাজশাহী শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে সরকারী ও বেসকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরদায় রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ স্থাপিত হয়েছে ষাটের দশকে এবং সে সময় থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি প্রভূত অবদান রেখেছে। আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী রাজশাহী শহর এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে বহু মাদ্রাসা স্থাপিত হয়ে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইসলামী ও দীনী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজশাহীর জনগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং আন্দোলনের ধারায় গতি সঞ্চার করেছেন। এই আন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী পাক বাহিনীর হাতে জীবন দান করেছেন। রেশম শিল্পের জন্যে রাজশাহীর যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে এবং রাজশাহী সিল্ক অর্থকরী পণ্য হিসেবে সর্বত্র সমাদৃত। রাজশাহীর আম, ফলের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু। রাজশাহী অঞ্চলের গম্ভীরাগান, মারফতী, মুর্শিদী ও জারি গান রাজশাহীর ন্যায় জনগণের চিত্তবিনোদনের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয় এবং এর দ্বারা আঞ্চলিক সংস্কৃতির একটি ধারাকে উপস্থাপন করে। এসব বিষয়কে সামনে রেখে রাজশাহী জেলা সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আলোচনার প্রয়াস পাব।

পরিশেষে আল্লাহ্ পাকের অশেষ শুকুরীয়া আদায় করে এবং তাঁর রহমত কামনা করে আমি আমার প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ করলাম। আল্লাহ্ হাফিয।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজশাহী।

এ কে এম ইয়াকুব আলী
জুন, ১৫, ১৯৯১ ইং

বিষয় সূচী

প্রথম অধ্যায়

জেলা পরিচিতি

স্থান নির্দেশ ও পটভূমি

রাজস্ব ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বাংলায় জেলার পুনর্বিন্যাস হয়েছে ইংরেজ শাসনামলে।১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী বিপর্যয়ের পরিণতি হিসেবে বাংলার স্বাধীন নবাবী আমলের অবসান ঘটে এবং বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায়। ক্রমান্বয়ে ইংলন্ডের উপনিবেশ হিসেবে কেবলমাত্র বাংলা নয়, বরং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ বিদেশী শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মুঘল বাদশাহের নিকট হতে দেওয়ানী লাভ করে বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কোম্পানী প্রাপ্ত হয়। কাজেই এ দেশে শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্যে বৃটিশ সরকার একটি অঞ্চলকে ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত করে এবং ক্রমান্বয়ে সেগুলো প্রশাসনের ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হয়। বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত জেলার ধারণা ও কার্যক্রম আমাদের বাংলাদেশের জেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিভিন্ন মহকুমাকে জেলা পর্যায়ে উন্নীত করার পূর্বে জেলার যে অবস্থিতি ছিল, সে হিসেবে রাজশাহী জেলার উপর আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।[১]

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, রাজস্ব ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের সুবিধার্থে এ দেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করার রীতি অনেক পূর্বে প্রচলিত ছিল। শিলালিপি ও তাম্র শাসনের সাক্ষ্যে বলা যায় যে, প্রথমে গুপ্ত এবং পরে পাল ও সেন আমলে তাদের অধিকৃত ভূখন্ড বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করা হয় যা রাজস্ব ইউনিট হিসেবেও বিবেচিত হয়। এ সবের মধ্যে ভুক্তি, মন্ডল, বীথি, বিষয়, গ্রাম ও পাটক উল্লেখযোগ্য। ভুক্তি সর্বোচ্চ বিভাজিত অঞ্চল যা বর্তমান প্রদেশের চেয়ে

আয়তনে বড়। কয়েকটি মন্ডল নিয়ে একটি ভুক্তি গঠিত হয়। সে হিসেবে বৃটিশ শাসনাধীন একটি জেলার চেয়ে মন্ডল আয়তনে বড় ছিল। একটি মন্ডলে অনেকগুলি বিষয়, একটি বিষয়ে অনেকগুলি গ্রাম ও পাটক অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে তুর্কী মুসলমানদের বিজয়ের পর লাখনাবতী রাজ্যকে কয়েকটি ইকতায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক ইকতায় একজন মুকতা বা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।[৩] খলজী তুর্কীগণ প্রশাসনের এই অভিজ্ঞান মধ্য এশিয়া হতে সাথে করে এনেছিলেন । এটি তারা উত্তরাধিকার সূত্রে আব্বাসীয় শাসন থেকে পেয়েছিলেন। বিজিত অঞ্চলকে বিভিন্ন রাজস্ব ও প্রশাসনিক অংশ হিসেবে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা) (৬৩৪-৬৪৪ খৃঃ) ভাগ করে যে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন তা পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ বিভিন্ন দেশে অনুসরণ করেছিলেন। কাজেই বাংলার ক্ষেত্রে এরূপ বিভাজনের ধারণা মুসলমানদের অন্য কোন জাতির নিকট থেকে ধার করার প্রয়োজন পড়েনি। তাই সুলতানী বাংলায় (১২০৪-১৫৭৬খৃঃ) মুদ্রা ও শিলালিপির সূত্রে ইকতা ছাড়াও প্রশাসনিক বিভাজন হিসেবে ইকলীম, দিয়ার , আরসা, খিত্তা[৪] নামের সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটে। এমনকি থানার নাম সমসাময়িক বিবরণ হতে জানা যায়।[৫] মুঘল শাসনামলে (১৫২৬-১৮৫৭ খৃঃ) বিশেষ করে আকবরের সময় মুঘল সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন সুবায় ভাগ করা হয় । বাংলা তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সুবা । বাংলা সুবাকে আবার উনিশটি সরকারে বিভক্ত করা হয়।[৬] প্রত্যেকটি সরকারের অধীন বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যার পরগণা বা মহল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সুবার সরকারসমূহের অধিভুক্ত পরগণার সংখ্যা ছিল ৬৮৪ টি। কিন্তু ১৭২২ খৃষ্টাব্দে নওয়াব জাফর খান (মুর্শিদকুলী খান) সরকারের পরিবর্তে সুবায়ে বাংলায় চাকলা নামের প্রবর্তন করেন এবং তাকে তেরটি চাকলায় বিভক্ত করেন । পরগণার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে পূর্বের ৬৮৪ টির স্থলে ১৬৬০টি পরগণা সৃষ্টি করেন।[৭] এই তেরটি চাকলার মধ্যে চাকলা রাজশাহী অন্যতম। আকবরের আমলে সরকার বারবাকাবাদ ও সরকার ঘোড়াঘাটের অধিভুক্ত পরগণাসমূহের অধিকাংশ চাকলা রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৮] তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে

পৌঁছতে পারি যে, এ দেশে পূর্বের প্রচলিত সকল বিভাজন নিয়ম প্রাক-মুসলিম যুগের মন্ডল সুলতানী আমলের ইকতা ও আরসা এবং মুঘল যুগের সরকার ও চাকলা বৃটিশ যুগের জেলা গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ।

রাজশাহী বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য জেলা। বৃটিশ শাসনামলে এর সৃষ্টি হলেও এই স্থানের প্রাচীনতা সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে পুরাকীর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তা থেকে আমরা এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারি। পুন্ড্র অঞ্চল এ দেশের একটি প্রাচীন জনপদ। ক্রমান্বয়ে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন যুগে এই জনপদের পরিসীমা বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং তা পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি হিসেবে এক বিরাট অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি বাংলার দু-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত। পশ্চিমে গঙ্গা-ভাগীরথীর সম্মিলিত ধারা, পূর্বে করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র মেঘনার ধারা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে হিমালয় পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির সীমা হিসেবে গণ্য করা হয়। বরেন্দ্র পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির একটি বৃহৎ মন্ডলা বা প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে গণ্য এবং তাকে প্রাচীন পুন্ড্রের সাথে অভিন্ন বলে মনে করা হয় । বরেন্দ্রের সীমা হিসেবে পশ্চিমে মহানন্দা ও গঙ্গার স্রোতধারা, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে করতোয়া এবং উত্তরে দেবকোট নির্দেশ করা হয়। রাজা গণেশের জমিদারি পরগণা ভাতুড়িয়া, আত্রাই নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরের ভূখন্ডের জন্যে প্রযোজ্য এবং তার পশ্চিমে মহানন্দা ও শাখানদী পুনর্ভবা, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে করতোয়া এবং উত্তরে দিনাজপুরকে সীমানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[৯] প্রকারান্তে প্রাচীনকালের পুন্ড্র, বরেন্দ্র ও ভাতুড়িয়া পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে বর্তমানের রাজশাহী জেলার প্রতিনিধিত্ব করে । পুরাভূমি হওয়ার কারণে এই অঞ্চলেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছে, রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর রূপরেখা তৈরি হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন স্রোত থেকে প্রবাহিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির বালিয়াড়ি জমেছে এবং পরিশেষে সেগুলো ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার উপকরণ হয়ে বাংলার ইতিহাস, সমাজ ও সভ্যতার পুনর্গঠনে মৌলিক অবদান রাখতে সহায়তা করেছে।

আধুনিক রাজশাহী জেলা গঠনের পটভূমি সম্পর্কে আরো কিছু বলার অবকাশ আছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হতে কোম্পানী–শাসন আইন–শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং প্রশাসন ও বিচারের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে বিভিন্ন জেলায় পুনর্বিন্যাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।মুঘল আমলের চাকলা রাজশাহী যার বিস্তৃতি পদ্মা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত ছিল তা হতে পদ্মার দক্ষিণ অংশ কেটে নিয়ে অন্য জেলা সৃষ্টি করা হয় । কিন্তু তাতেও দূরবর্তী অঞ্চলে আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় জেলার পরিসীমা আরও কিছু ছোট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।[১০] সে জন্যে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রহনপুর ও চাঁপাই থানাদ্বয়কে রাজশাহী হতে পৃথক করে দিনাজপুর ও পুর্নিয়ার সাথে যোগ করে দিয়ে আলাদা জেলা সৃষ্টি করা হয় । এরপর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আদমদিঘী, নওখিলা, শেরপুর ও বগুড়া থানাগুলোকে রাজশাহী হতে পৃথক করা হয় এবং সে সবের সাথে রংপুরের দুটি থানা ও দিনাজপুরের তিনটি থানার সংযোগ সাধন করে বগুড়া জেলা গঠন করা হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীর পাঁচটি থানা–শাহজাদপুর, খেতুপাড়া, রায়গঞ্জ, মাথুরা ও পাবনা এবং যশোরের চারটি থানা আলাদা করে নিয়ে পাবনা জেলা গঠন করা হয় । এভাবে বাংলার উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের পুনর্বিন্যাস সাধিত হয় । ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত (পুনর্বিন্যাস চলাকালে) রাজশাহী জেলার সদর দফতর ছিল নাটোর। কিন্তু উক্ত স্থানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে রাজশাহীর তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ জে. এ. প্রিঙ্গালের রিপোর্টের ভিত্তিতে নাটোর হতে সদর দফতর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। এ বছর থেকে আমরা বর্তমান রাজশাহী জেলার প্রকৃত উৎপত্তি বিবেচনা করতে পারি। তবে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের দেশ বিভাগের ফলে মালদহের চাঁপাইনবাবগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তানের (পরবর্তীতে বাংলাদেশের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে রাজশাহী জেলার পরিসীমাকে বৃদ্ধি করে তোলে। বর্তমানকালের রাজশাহী সেই আয়তনকে বহন করে চলেছে। তবে সেটা রাজশাহী সদর (রামপুর বোয়ালিয়া) নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে, পৃথক পৃথক জেলা গঠনের পূর্ব পর্যন্ত প্রযোজ্য । পূর্বে বলেছি যে, আমাদের আলোচনা

মহকুমাগুলোকে জেলা পর্যায়ে উন্নীত করার পূর্বে বৃহত্তর রাজশাহীকে কেন্দ্র করে হবে ।

নামকরণ

রাজশাহীর নামকরণ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য দিয়ে কোন বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দেয়া যায় না । শাহ মখদুমের নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজশাহীর বাঘা মখদুম নগর হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। 'রাজ' ও 'শাহী' এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে রাজশাহী হয়েছে বলে ধারণা করা যায় । দুটি শব্দের অর্থ রাজকীয় ক্ষমতাভুক্ত অঞ্চল । এতে করে এ নামের শাব্দিক প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, এ অঞ্চলটি বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও বংশের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল বলে একে রাজশাহী নামে আখ্যায়িত করা হয় । মৌর্য, পাল, সেন ও মুসলিম আমলে এ অঞ্চলের বিভিন্ন কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রশাসন এবং শিক্ষা–সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এ সবের মধ্যে রাজশাহী নামের সার্থকতা খুঁজে বের করা নিরর্থক নয়। ব্লকম্যানের মতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাতুড়িয়ার জমিদার এবং ইলিয়াস শাহী বংশের প্রভাবশালী অমাত্য রাজা গণেশ চক্রান্ত করে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসনকে উৎখাত করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন ।

মুসলমান সুলতান শাহ হিসেবে এবং হিন্দু শাসক রাজা হিসেবে পরিচিত । মুসলমান সুলতানের শাসিত অঞ্চলে হিন্দু রাজা গণেশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তাকে রাজশাহী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে [১১] এসব মত রাজশাহীর নামকরণের ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ না করা গেলেও আমরা ধরে নিতে পারি যে, রাজকীয় শাসনের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এই অঞ্চলের নিদর্শন বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা এর নামের সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ । রাজশাহী সদর দফতর বুয়ালিয়া শব্দটি 'বু' ও 'আউলিয়া' শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয় । 'বু' ফারসী এবং 'আউলিয়া' আরবী শব্দ । এর অর্থ করলে দাঁড়ায় আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত প্রাণ ওলীদের ঘ্রাণ গ্রহণের স্থান অর্থাৎ যে স্থান ওলীদের পদচারণায় পবিত্র হয়ে উঠে এবং তার সুঘ্রাণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাকে বুয়ালিয়া হিসেবে অভিহিত করা যায়। রাজশাহীর জন্যে এ নামের ব্যবহার

তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শাহ মখদুম ছাড়াও অনেক সূফী-সাধকের আগমনের ফলে এ স্থান জাগতিক উন্নতির সাথে সাথে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ পেয়ে ধন্য হয়েছে। জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী হতে জানা যায় যে, রাজশাহীতে অসুর ও দেও জাতীয় পরাক্রমশালী নৃপতিদের মঠ, মন্দির, দেব-দেবীর প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য দিয়ে পূর্ণ ছিল। মুসলিম আগমনের প্রাক্কালে এ অবস্থা বিরাজ করছিল। তখন এর নাম ছিল মহাকাল গড়।[১২] এ প্রকারের কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক মূল্য তেমন না থাকলেও এসব আখ্যান থেকে রাজশাহীর প্রাচীনতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

অবস্থান, আয়তন ও লোকসংখ্যা

রাজশাহী জেলা সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় বৃটিশ শাসনামলে এর আয়তন ছিল ২৬১৮ বর্গমাইল এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা ছিল ১৪, ৮০, ৫৮৭ জন।[১৩] কিন্তু বর্তমানে এর আয়তন হচ্ছে ৩,৬৫২ বর্গমাইল।[১৪] ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের দেশ বিভাগের পর মালদহের চাঁপাইনবাবগঞ্জ সংযোজিত হওয়ার ফলে বর্তমানের এই আয়তন এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজশাহীর লোকসংখ্যা ৪২,৬৮,৪১৭ জন।[১৫] তবে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী তার লোকসংখ্যা ৫২,৬৩,০০০ জনে দাঁড়িয়েছে। এ জেলায় চারটি মহকুমা, ৩১টি পুলিশ ষ্টেশন, ২৭২টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ৬,১৯২টি গ্রাম আছে।[১৬] এ জেলা ২৪°-৬' থেকে ২৫°-১৩' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°-২' থেকে ৮৯°-২১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। আলোচ্য জেলার বর্তমান সীমানা উত্তরে দিনাজপুর ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর, পূর্বে বগুড়া ও পাবনা জেলা, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে পদ্মা নদী।

নদ-নদী ও উৎপন্ন দ্রব্য

জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে নদ-নদীর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও দেশের মধ্যে পণ্য দ্রব্যের সুষ্ঠু চলাচলের জন্যে নদী আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করে। বর্তমানে রেল ও

সড়ক পরিবহন নিয়মিত থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং অপর দিকে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় নদী পথের গুরুত্ব অতীতের তুলনায় বহুল পনিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তবুও বর্ষাকালে গ্রাম বাংলার মানুষ নদী পথে যাতায়াত করে এবং দেশের এক স্থান হতে অন্য স্থানে পণ্য দ্রব্য সরবরাহ করে। প্রাচীনকালে সাগর ও নদীর তীর বেয়ে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং তা মানব জাতির ইতিহাসে গতি সঞ্চার করে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মিসরের নীল নদের তীরে মিসরীয় সভ্যতা, মিসোপটেমিয়ার দাজলা-ফোরাত উপকূলে এ্যাসিরীয় ব্যাবিলনীয় সভ্যতা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু তীরে সিন্ধু সভ্যতা মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় বিরাট অবদান রেখে ভবিষ্যত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নির্ধারণে অনুপ্রাণিত করছে। আমাদের বাংলাদেশের নদী তীরে প্রধান শহরগুলো গড়ে উঠেছিল এবং মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। পদ্মার তীরে গড়ে উঠা রাজশাহী শহর তারই একটি উদাহরণ। বর্তমানে পদ্মার শীর্ণ অবস্থা রাজশাহীর ঐশ্বর্য অনেকাংশে ব্যাহত করেছে। অতীতে রাজশাহীর সাথে পদ্মার বুক দিয়ে যে যোগাযোগ ছিল তা আর নেই। এতদসত্ত্বেও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং সর্বপ্রকার জীব ও উদ্ভিদের প্রজনন ও প্রবৃদ্ধির জন্যে নদীর স্বাভাবিক গতি ঠিক রাখতে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। রাজশাহী জেলায় প্রবাহিত নদীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। এ জেলায় যেসব নদী এখনও অধিবাসীদের জীবন যাত্রায় সহায়তা করছে তার মধ্যে পদ্মা, মহানন্দা, আত্রাই, বড়াল, মুসাখান, গুমানী, নারদ, তুলসীগঙ্গা, নাগর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদ্মা রাজশাহী জেলার উত্তর-পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণ সীমানা দিয়ে পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। মহানন্দা জেলার উত্তর সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোদাগাড়ী থানার নিকট এসে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর মহানন্দার তীরে অবস্থিত। আত্রাই নদী জেলার উত্তর দিক হতে প্রবেশ করে মোটামুটি মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলন বিলকে অতিক্রম করে পাবনা জেলার শাহজাদপুরের নিকট করতোয়ার সাথে মিলিত হয়েছে। পশ্চিমে আত্রাই এবং পূর্বে করতোয়ার মধ্যস্থিত উর্বর ভূমিকে বাংলার দুয়াব হিসেবে

অভিহিত করা হয়েছে।[১৭] এসব নদী বর্ষাকালে পলি বয়ে নিয়ে আসে, ফলে এ অঞ্চলে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

রাজশাহীর প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান,পাট, গম ও ইক্ষু উল্লেখযোগ্য। রাজশাহীতে যে ধান উৎপন্ন হয় তা এ জেলার চাহিদা পূরণ করার পর উদ্বৃত্ত থাকে এবং ঘাটতি এলাকার অভাব মিটাতে সক্ষম হয়। এছাড়া মৌসুমী ফলের মধ্যে রাজশাহী–আম ও লিচুর জন্যে বিখ্যাত। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়ে আসছে। কাঁঠালও এ অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। বাঘার সুলতানী আমলের মসজিদের পোড়া মাটির ফলকে কাঁঠালের উপস্থাপন[১৮] হতে অনুমান করা যায় যে, অতীতেও এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মৌসুমী ফল হিসেবে কাঁঠালের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে হতো। এসব উৎপাদিত ফসলের আধিক্য এ জেলার কৃষিভিত্তিক জনগণের আর্থিক সচ্ছলতার উপর আলোকপাত করে।

প্রাচীন স্থান

এ জেলায় প্রাক–মুসলিম এবং মুসলিম যুগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ অনেক স্থান বিদ্যমান। এসব স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ এবং স্থাপত্যিক নিদর্শন আমাদেরকে অতীতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে মুদ্রা, শিলালিপি ও পুরাকীর্তির আকারে এমন অনেক তথ্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে যা ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করছে। এ জেলার প্রাচীনতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থানের উপর সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা পেশ করার প্রয়াস পাব।

পাহাড়পুর

পাহাড়পুর এ জেলার একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার আছে। এটিকে সোমাপুরী মহাবিহার হিসেবে অখ্যায়িত করা হয়। পাল রাজা ধর্মপাল খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এ মহাবিহার নির্মাণ করেন। এরূপ একটি বৃহৎ আকারের

কোন বৌদ্ধ বিহার এ উপমহাদেশের কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি।[১৯] বৌদ্ধদের ধর্মশালাকে বিহার বলা হয়। ধর্ম সম্পর্কে পাঠদান এখানে সম্পন্ন হয়, এবং এর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বাস করে। পাহাড়পুরের সোমাপুরী মহাবিহারের আয়তন ৯২০ বর্গফুট এবং প্রায় ১৩ফুট দৈর্ঘ্যের ১৭৭টি প্রকোষ্ঠ আছে। এখানে বৌদ্ধদের পূর্বে জৈন মন্দির ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২০] পাহাড়পুর হতে বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা হারুন–অর–রশিদের ১৭২ হিজরী /৭৮৮ খৃষ্টাব্দের একটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।[২১] এ মুদ্রার উপর ভিত্তি করে কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে, এ অঞ্চলে অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সূফী–সাধক এসেছিলেন।[২২] বৌদ্ধদের হাতে সম্ভবত তাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন অথবা কোন ব্যবসায়ী আরব থেকে এখানে এসেছিলেন এবং ব্যবসায়ের সূত্রে আব্বাসীয় মুদ্রা এ অঞ্চলে নীত হয়েছিল। প্রাপ্ত মুদ্রা সম্পর্কে যে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হোক না কেন, অন্তত আমরা এ ধারণা করতে পারি যে, আরবদের সাথে এ অঞ্চলের যোগাযোগ মুসলিম বিজয়ের অনেক পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল। পাহাড়পুরের অনেক প্রাচীন নিদর্শন রাজশাহীর বরেন্দ্র যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

বিজয়নগর

বিজয়নগরকে বিজয়পুরের সাথে অভিন্ন মনে করা হয় এবং তা সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের রাজধানী শহর ছিল।[২৩] রাজশাহী শহর থেকে সাত মাইল পশ্চিমে রাজশাহী–চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের পাশে এটি অবস্থিত। বিজয়নগরের ধ্বংসস্তূপ থেকে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে এবং সেসব রাজশাহী বরেন্দ্র যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

কুমারপুর

কুমারপুর রাজশাহী শহর থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় বার মাইল দূরে রাজশাহী–চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। বিজয় সেনের রাজধানী হিসেবে

কথিত বিজয়নগরের সাথে এর সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। অষ্টম-নবম শতাব্দী হতে এ স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে একটি ইষ্টক নির্মিত সমাধি ইমারত আছে, যাকে স্থানীয় জনশ্রুতির উৎসে সূফী-সাধক মুকাররম শাহের মাকবারা হিসেবে অভিহিত করা হয়।[২৪]

নওদা

নওদা রহনপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে প্রায় দু'মাইল দূরে পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত এবং এর সংলগ্ন প্রায় পনের বর্গমাইল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ ও পুরাকীর্তি এ স্থানের প্রাচীনতার স্বাক্ষর বহন করে। মিনহাজ সিরাজ কর্তৃক উল্লেখিত লক্ষণ সেনের রাজধানী নওদিয়াকে[২৫] নওদা বুরুজ বা দুর্গের সাথে অভিন্ন মনে করা হয়েছে।[২৬]

সুলতানগঞ্জ

সুলতানগঞ্জ রাজশাহী শহর থেকে পশ্চিমে প্রায় উনিশ মাইল দূরে রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত একটি প্রাচীন বসতিপূর্ণ স্থান। জনশ্রুতি অনুযায়ী এখানে সুলতান শাহের একটি ইট নির্মিত সমাধি ইমারত আছে। পদ্মা-মহানন্দার সঙ্গমস্থল হিসেবে বাংলায় মুসলিম শাসনামলে দেশের এ স্থান উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের নৌযোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখত এবং উত্তরাঞ্চলের পণ্য দ্রব্য বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে অন্যান্য স্থানে সরবরাহ করতো।

লাখনাবতী বা গৌড়

লাখনাবতী লক্ষণ সেনের রাজধানী শহর ছিল। লক্ষণ সেন এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এর অপর নাম গৌড়। পদ্মা নদীর পূর্ব তীরে এ শহর অবস্থিত। সুলতানী বাংলার রাজধানী ছিল এই গৌড় বা লাখনাবতী। রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার অংশ বিশেষ এবং পশ্চিম বাংলার মালদহের এক বিস্তৃত অঞ্চল গৌড় বা লাখনাবতী নামে পরিচিত। রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার অংশ বিশেষ গৌড়ের

শহরতলীরূপে গণ্য হয়। এ অঞ্চলেও বাংলার সুলতানী ও মুঘল আমলের বেশ কিছু স্থাপতিক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। এ সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মাহিসন্তষ

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় সত্তর মাইল উত্তরে নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত ধামুরহাট থানার মধ্যে অবস্থিত। মাহিসন্তষ একটি প্রাচীন সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করে চলছে। প্রায় চার থেকে পাঁচ মাইল ব্যাপী উঁচু টিলা ও ধ্বংসের চিহ্ন এর প্রাচীনতা ঘোষণা করছে। এ স্থানের স্থাপত্য ইমারত ও প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের সাক্ষ্যে বলা যায় যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে ষোড়ষ শতাব্দী পর্যন্ত এটি সামরিক ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এখানে একটি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল যার অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবী।[২৭] বারবাকাবাদ টাঁকশালকে মাহিসন্তষের সাথে অভিন্ন মনে করা হয়।[২৮] চতুর্থ অধ্যায়ে এ স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

বাঘা

বাঘা এখন একটি থানা। রাজশাহী শহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এটি অবস্থিত। পূর্বে সরকার বারবাকাবাদের অন্তর্গত লস্করপুর পরগণার এটি একটি অংশ ছিল। সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩১ খৃঃ) আমলের ৯৩০ হিজরী/১৫২৩-২৪ খৃষ্টাব্দের একটি মসজিদ এখানে বিদ্যমান।[২৯] সম্ভবত হুসাইন শাহী আমলের একটি মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তন এখানে বিদ্যমান ছিল। পরিব্রাজক আবদুল লতিফের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় একশত বছরের এক বৃদ্ধ জ্ঞানতাপস হাওদা মিয়া (প্রকৃত নাম হযরত হামীদ দানিশমন্দ) মৃত্তিকা নির্মিত দু'চালা ছাদের মাদ্রাসা ঘরে ছাত্রদেরকে পাঠদান করতেন।[৩০] বহু দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীরা এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে চারিদিকে জ্ঞানের মশাল প্রজ্বলিত রাখতেন। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

কুসুম্বা

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তরে মান্দা থানার অন্তর্গত আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে কুসুম্বা অবস্থিত। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ বিন মুহাম্মদ শাহ গাযীর (১৫৫৪–১৫৬০ খৃঃ) আমলে ৯৬৬ হিজরী/১৫৫৮ খৃষ্টাব্দের একটি মসজিদ এখানে বিদ্যমান।[৩১] এছাড়া স্থানটির পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপী উঁচু টিলাও ছড়ানো ছিটানো ইট এর প্রাচীনতার স্বাক্ষর বহন করে।

নাটোর

নাটোর এখন জেলা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। নাটোরের ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব আছে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী জেলার সদর দফতর রামপুর–বোয়ালিয়ায় স্থানান্তরিত করার পূর্বে নাটোর ছিল তার সদর দফতর। নাটোর জমিদারির ইতিহাস আমরা অবগত আছি। রানী ভবানীর কথা অনেকের জানা আছে। কিন্তু তার চেয়ে এর প্রাচীনতা সম্পর্কে আমাদের অনেকের অজানা রয়ে গেছে। তাবাকাত–ই–নাসিরীতে উল্লেখিত ইকতা বা প্রশাসনিক অঞ্চল নারকুটিকে শাব্দিক ধ্বনী ও অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করে নাটোরের সাথে অভিন্ন মনে করা হয়েছে।[৩২] এর মুকতা বা প্রশাসক ছিলেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর সঙ্গী আলাউদ্দীন আলী মর্দান খলজী।

---

১. বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় চারটি মহকুমা ছিল। এসবের নাম–রাজশাহী সদর, নাটোর, চাঁপাই–নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ। ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে পর্যায়ক্রমে এসব মহকুমা জেলাতে রূপান্তরিত হয়।

২. দ্রষ্টব্য–R. C. Majumdar ed. *The History of Bengal*, Vol. I (Dhaka : Dhaka University, 1943), p. 23 (Henceforth *HB*) ; pramode Lal Paul, *The Early History of Bengal*, Vol. I (Calcutta : The Indian Research Institute, 1939), p. 123 (Henceforth *EHB*.)

৩. Nizam ud Din Ahmad Bakhshi, *Tabaqat-i-Akbari*, Vol. II, Tr. B. De (Calcutta : Royal Asiatic Society of Bengal, 1936), p. 56; A.K. M. Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Barind, 1200-1576* (Unpublished Ph. D. Thesis), pp. 170-172, (Henceforth *ASCB*.).

৪. A. H. Dani, *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal* (Dhaka : Asiatic Society of Pakistan, 1957), pp. 109-113 ; *JVRM*, Vol. 6. pp. 103-105.

৫. A. H. Dani, *Bibliography*, p. 63; *Epigraphia Indo-Moslemica*, 1915-16, pp. 12-13.

৬. John Beams, "Notes on Akbar's Subahs", *Journal of the Royal Asiatic Society*, London, 1876 (Henceforth *JRAS*.). pp. 90 f.

৭. *JRAS*, p. 87.

৮. *JRAS*, 1935, pp. 87-88 ;

এ. কে. এম ইয়াকুব আলী, 'পুন্ড্র ও পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি', ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮০, পৃঃ ২৪–২৬।

৯. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers* : Rajshahi (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1916), pp. 29-30 ; *ASCB*, pp. 160-161.

১০. *District Census Report, Rajshahi*, 1961 ; *The District of Rajshahi: Its Past and Present* (Rajshahi : Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1983), p. 118.

১১. O'Malley, *Rajshahi*, p. 1.

১২. মুহাম্মদ আবু তালিব সম্পাদিত, *হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রঃ) এর জীবনেতিহাস* (ঢাকাঃ পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ১৯৬৯), পৃঃ ৬।

১৩. O'Malley, *op. cit*, p. 1.

১৪. Ashraf Siddiqi (ed.), *Bangladesh District Gazetteers* : *Rajshahi* (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1976), pp. 1-2.

১৫. *Village Population Statistics* : Rajshahi District, 1974.

১৬. *Monthly Statistical Bulletin of Bangladesh* (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, July, 1981), p. 4.

১৭. Mirza Nathan, *Bahristan-i-Ghaybi*, Vol. I, Tr.M.I. Borah (Gauhati : The Historical and Antiqurian Studies, Government of Assam, 1936), p. 22 ; *ASCB*, pp. 100-101.

১৮. *ASCB*, p. 272, f. n. , 392.

১৯. *Archaeological Survey in India, Annual Report (ASI-AR)*, 1927-28, p. 196 ; IBS Seminar Volume No. 4, 1981, p. 13.

২০. K.N. Dikshit, *Excavations at Paharpur, Bengal Memoirs of the Archaeological Survey of India (MASI)*, No. 55, Delhi, 1938, p. 73 ; *Epigraphia Indica*, Vol. XX, Delhi, 1933, pp. 53ff.

২১. K. N. Dikshit, *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 55, Delhi, 1958, p. 87.

২২. এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, পৃঃ ১২।

২৩. রমা প্রসাদ পন্দ, *গৌড় রাজমালা*, রাজশাহী, ১৯২২, পৃঃ ৭৫।

২৪। কে. এম. মিছের *রাজশাহীর ইতিহাস*, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪১ ; S. Ahmad, *Inscriptions of Bengal*, Vol. IV, p. 244.

২৫. Minhaj Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, Vol. I, ed. Abdul Hai Habibi (Kabul : Historical Society of Afghanistan, 1963), p. 426, *(TN)*.

২৬. *Journal of the Varendra Research Museum*, Vol. 6, Rajshahi University, 1980-81, pp. 68 ff. *(JVRM)*.

২৭. Shah Shuayb, *Manaqib al-Asfiya*, extract printed at the end of *Maktubat-i-Sadi*, p. 339 *The District of Rajshahi, Its Past and Present*, p.67.

২৮. A.H. Dani, *Bibliography*, p. 28; *The District of Rajshahi*, p. 68.

২৯. A. H. Dani, *Bibliography*, p. 68 ; S. Ahmad, *Inscriptions of Bengal*, Vol. IV, Rajshahi, 1960, p. 214 *(IB)* ; *ASCB*, p. 293.

৩০. *Bengal Past and Present (BPP)*, 1928, p. 143.

৩১. S. Ahmad, *IB*, pp. 242-44.

৩২. *Indian Culture*, 1944, p. 45, f. n. 2.

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক-মুসলিম যুগ

জনগোষ্ঠী ও সমাজ

রাজশাহী জেলা বরেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। পুরাভূমি হওয়ার কারণে বাংলার নিম্নাঞ্চল অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে রাজশাহী জেলার আওতাভুক্ত ভূখণ্ডে জনবসতি অনেক পূর্ব থেকে শুরু হয়েছে। আর্য জনগোষ্ঠী পূর্ব ভারতে [illegible] বাংলায় অনেক পরে বসতি স্থাপন করে। আমুদরিয়া ও সিরদরিয়ার মধ্যবর্তী বর্তমান রাশিয়ার উরাল পর্বতের নিম্নদেশে সমতল ভূমিতে আর্যদের আদি নিবাস ছিল বলে ধারণা করা হয়।[১] প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সেখানে তারা বাস করতো। এইসব মানুষ চাষাবাদ করে কিংবা পশু পালন করে জীবিকা অর্জন করতো। তারা দেখতে খুব ফর্সা ও সুশ্রী ছিল। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দীর্ঘ দেহ, বড় চোখ, সোনালি চুল, প্রশস্ত কপাল ও উন্নত নাসিকার অধিকারী ছিল এসব ব্যক্তি।[২] সময়ের বিবর্তনে উন্নত জীবিকার সন্ধানে তারা বিভিন্ন দিকে যেতে শুরু করে। তাদের মধ্যে কেউ ইরাক ও ইরানে এবং কেউ আফগানিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে তারা ভারতে প্রবেশ করলেও খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ[৩] অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে[৪] তারা বাংলায় প্রবেশ করে। তবে মিথিলা (বিদেহ) বা উত্তর বিহারের সাথে বরেন্দ্রের ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকার কারণে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের চেয়ে বরেন্দ্রের অন্তস্থিত রাজশাহী জেলায় আর্যদের আগমন প্রারম্ভিক সময়ে হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তীকালের হিন্দু ব্রাহ্মণ তাদেরকে আর্যদের উত্তর পুরুষ হিসেবে গণ্য করে। আর্যদের আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলে এমন এক জনগোষ্ঠী বাস করতো যারা মঙ্গোলীয়--দ্রাবিড় নব ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জনগোষ্ঠীর আচার--আচরণ ও সংস্কৃতি ছিল আলাদা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, পুন্ড্র নামে এক শক্তিশালী জাতি এই অঞ্চলে বাস

করতো।[5] ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও সাধারণত এর স্থিতিকাল খৃষ্টপূর্ব আট ও সাত শতাব্দী ধরা হয়।[6] কাজেই এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে অন্ততপক্ষে পুন্ড্রের অস্তিত্ব ছিল। মহাভারত ও পুরাণাদিতে পুন্ড্রকে ঋষি দীর্ঘতমার ক্ষেত্রজ সন্তান হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[7] মহাভারত ও পুরাণাদির রচনাকাল বহুল বিতর্কিত। তবে সাধারণভাবে মহাভারতের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব চার শতাব্দী হতে শুরু করে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এবং পুরাণাদির রচনাকাল খৃষ্টাব্দ একাদশ–দ্বাদশ শতাব্দীতে ধরা হয়।[8] এমতাবস্থায় দেখা যায় যে, পরবর্তী সময়েও পুন্ড্রের নাম চলে এসেছে। সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে বর্ণিত এসব উপাখ্যানের ঐতিহাসিক বিশেষ কোন মূল্য না থাকলেও এসব ঘটনা থেকে এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, পুন্ড্র এক আদিম অধিবাসীর নাম এবং তাদের আবাসভূমি পুন্ড্রভূমি হিসেবে অভিহিত হয়েছিল। রাজশাহী জেলা তদানীন্তন পুন্ড্রভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[9] আর্য আধিপত্য বিস্তার লাভের সাথে সাথে আর্যগণ অনার্য বা স্থানীয় অধিবাসীর সাথে অনেক ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে প্রবৃত্ত হন এবং এ জন্যেই বোধ হয় আর্যশাস্ত্রবিদগণ আন্তঃবিবাহের নামে ঋষি কর্তৃক ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের কল্পিত কাহিনীর অবতারণা করার প্রয়াস পান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুন্ড্রদেরকে দস্যুজীবী[10] আখ্যায়িত করার মধ্যে পরোক্ষভাবে তাদের শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। যদিও অনেক পরবর্তী সময়ের, তবুও শিলালিপি ও তাম্র শাসনের সূত্রে বলা যায় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হতে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের প্রভূত ভূমি দান করা হয়েছিল।[11] এ জেলার আদি অধিবাসী হিসেবে পুন্ড্রর সাথে শবর ও পোড জনগোষ্ঠীর উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। শবর কুলীদ শ্রেণীভুক্ত ছিল এবং হিমালয়ের উত্তর–পূর্বদিক হতে প্রবেশ করে তারা বরেন্দ্রের অধিভুক্ত রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু আর্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে তারা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ ও মিথিলার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে ভবঘুরে জীবন–যাপন করতে থাকে, আর্যদের সাথে শক্তির দ্বন্দ্বে পুন্ড্র আদি অধিবাসী কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। কথিত আছে যে, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই আদি অধিবাসীর একটি শাখা জৈন ধর্ম গ্রহণ করে বর্ণ জাতির

অন্তর্ভুক্ত হতে চেষ্টা করে। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে এই পুন্ড্র জাতি তুঁত চাষ করে সিল্ক শিল্পের সূচনা করে এবং পরবর্তীতে মুসলিম বিজয়ের পর এই আদি অধিবাসীর বৃহত্তর অংশ ইসলাম গ্রহণ করে।[12] তাঁর এই অভিমতের কোন উৎস বা সূত্র উল্লেখ করেননি। তবে তবাকাত–ই–নাসিরীতে উল্লেখিত মেচ আদিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ[13] থেকে চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিমতকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। পোড আদি অধিবাসী মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী সময়ের আদি অধিবাসী কোচ কর্তৃক পোড সম্প্রদায় এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়। মিনহাজ সিরাজের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোচ, মেচ ও সারু নামে তিনটি সম্প্রদায় এই অঞ্চলে বাস করতো।[13] নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে তাদের মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু পুন্ড্র, শবর ও পোডের কোন উল্লেখ তবাকাত–ই–নাসিরীতে দেখা যায় না। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বর্ণবাদী আর্যদের শক্তির সাথে টিকে উঠতে না পেরে ক্রমান্বয়ে এসব জনগোষ্ঠীর বিলুপ্তি ঘটেছে, অথবা তারা অন্যত্র চলে গিয়েছে কিংবা পরবর্তী কালের কোচ, মেচ ও সারু আদিবাসীদের সাথে মিশে গিয়েছে। সংস্কৃত উৎসের বিশ্লেষণ করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থানের আদিবাসীদের সাথে বহিরাগত আর্যদের সংঘর্ষ লেগেছিল। অথচ দেখা যায় যে, এই অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠী কোচ ও মেচ মুসলিম সংস্কৃতিকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেনি। বরং ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর ১২০৪ খৃষ্টাব্দে লাখনৌতী বিজয়ের পর মেচ ও কোচ জনগোষ্ঠীর লোক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। আলী মেচ ও তাঁর সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।[14] উপরন্তু মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী তিব্বত অভিযানে পরাজয়ের পর তাঁর প্রতি কোচ ও মেচ সম্প্রদায়ের সমর্থন এটাই নির্দেশ করে যে, মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি তারা বৈরী মনোভাব পোষণ করেনি। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সাঁওতাল এ অঞ্চলের আদিবাসী নয়। বরং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের পর সাঁওতাল পরগণা হতে বিতাড়িত হয়ে তারা এখানে বসতি স্থাপন করে।[16] মুসলিম আগমনের পূর্বে অভিজাত আর্য ও উচ্চবর্ণের জনগোষ্ঠী সমাজের উপর তলার লোক ছিল এবং তারা সব রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। প্রশাসনিক দায়িত্বে এবং ব্যবসা–বাণিজ্যে

তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অপরপক্ষে এখানকার আদি অধিবাসী ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হতো। উচ্চবর্ণ সামন্তদের হাতে এরা বিভিন্নভাবে অধিকার বঞ্চিত হতো। সমাজ কাঠামো পৌরমুখী হয়ে উঠেছিল এবং শাসকগোষ্ঠী তা নিয়ন্ত্রণ করতো এরূপ সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের কল্যাণ খুব একটা আশা করা যায় না। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, জমির চাষাবাদে নারীদেরও অংশগ্রহণ করতে হতো।[১৭] সম্ভবত এরা আদিবাসীদের স্ত্রী-কন্যা ছিল। কারণ অভিজাত শ্রেণীর স্ত্রী-কন্যাগণ আরাম-আয়াসে দিন কাটাতো এবং তাদের কায়িক পরিশ্রমের কোন প্রামাণ্য তথ্য আমাদের হাতে নেই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চলের শাসন কাঠামো ও সমাজ বিন্যাসের সমীক্ষা নিলে দেখা যায় যে, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের শাসনাধীনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, এবং শাসক-শ্রেণী ধর্ম-যাজক ও পুরোহিতদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সাধারণ জনগোষ্ঠীর শোষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিল।

এ অঞ্চলের প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্র শাসন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত রাজশাহী জেলাভুক্ত ভুখন্ড গুপ্ত শাসনের অধীন ছিল। এই সময় জৈন ও ব্রাহ্মণ্যবাদ এই অঞ্চলের প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাম্র শাসনের সূত্রে বলা যায় যে, সম্ভবত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজশাহীর অন্তস্থিত স্থানে বিখ্যাত জৈন বিহার বিদ্যমান ছিল এবং এক ব্রাহ্মণ দম্পতিকে অরট দেবতার আরাধনার জন্যে ভূমি দান করা হয়েছিল।[১৮] এ থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, গুপ্তরা জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং-এর বর্ণনায় তারই প্রতিধ্বনি হয়েছে।[১৯] কিন্তু ক্রমান্বয়ে জৈন ধর্মের প্রভাব এ অঞ্চল হতে হ্রাস পেতে থাকে। এর প্রধান কারণ হিসেবে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকে দায়ী করা যেতে পারে। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী পাল শাসকগণ সামন্ত ও ধর্মতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন এবং জৈন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি বৈরীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে রাজশাহীর পাহাড়পুরের সোমাপুর বৌদ্ধ বিহার

এবং বানগড় ও মহাস্থানের সন্নিকটে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ নিদর্শনসমূহ প্রমাণ করে যে, পাল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে। এই পদক্ষেপ নিতে গিয়ে তাঁরা জৈন বিহারের ক্ষতি সাধন করেন এবং জৈন ধর্ম-বিশ্বাসকে নিরুৎসাহিত করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পাহাড়পুরের সোমাপুর বিহারের পুরোহিতকে পাল প্রশাসনের পক্ষ হতে ভাটা গোয়ালী জৈন বিহারের নিষ্কর ভূমি জবর দখল করার আদেশ দেয়া হয়েছিল।[২০] অন্যান্য জৈন বিহারের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। এসব সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি যে, পাল শাসনামলে জৈন ধর্মের বিলোপ সাধন করে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলেছিল। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি পাল শাসকগণ প্রতিকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্র শাসনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, রাজশাহী জেলার অন্তস্থিত বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করা হয়েছিল এবং তাদের ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা হয়েছিল। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম আগমনের প্রাক্কালে বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিশ্বাস এ অঞ্চলের প্রচলিত ধর্মমত হিসেবে স্বীকৃত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে অতি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের ছত্রছায়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদ হিন্দু ধর্ম রাজশাহী সহ বরেন্দ্র অঞ্চলে শিকড় গেড়ে বসে। রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ্যবাদ হিন্দু ধর্মকে অধিক রক্ষণশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। কৌলিন্য প্রথা হিন্দু সমাজে অত্যন্ত ক্ষতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে, এবং এর ফলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু কুলীন হিন্দুদের নির্যাতনের শিকার হয়। উপরন্তু কুলীন ব্রাহ্মণগণ একত্রিত হয়ে স্বধর্মী বা বৌদ্ধদের এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আগুনে পুড়ে মেরে আনন্দ উপভোগ করতো।[২১] ফলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিগণ এই অঞ্চল ছেড়ে পূর্ববাংলা, সমতট এবং কামরূপে আশ্রয় গ্রহণ করে আর যারা এ অঞ্চলে থেকে যায় তারা ব্রাহ্মণ্যবাদের শিকারে পরিণত হয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম বিজয়কে বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে। রামাই পন্ডিত তাঁর শূন্য পুরাণে নিরঞ্জনের রুষ্মা অধ্যায়ে অতি সার্থকভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্মম কাহিনী ও বৌদ্ধদের কাতরানী এবং তার সাথে মুসলিম আগমনকে স্বাগত জানানোর ছবি তুলে ধরেছেন।[২২] পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই দীর্ঘ

সময়কালে ধর্মকে বঞ্চনা ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবস্থা করে প্রাক-মুসলিম শাসকগণ সমাজে বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণী সৃষ্টি করে রাজশাহী জেলাসহ এই বরেন্দ্র অঞ্চলের সমাজ কাঠামোতে শ্রেণী সংঘাতের বীজ বপন করেন এবং সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ বিপন্ন করে তোলেন

কোম প্রথা ও বর্ণ বিন্যাস

কোম আরবী কাওম শব্দের রূপান্তর। কাওম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জাতি। সাধারণত একই রক্ত ধারার জনসমষ্টিকে কাওম হিসেবে অভিহিত করা হয়, যদিও ব্যাপক অর্থে তা মিশ্রিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় এই জাতি গঠনের ব্যাপারে বিভিন্ন উপাদান বিবেচনা করা হয় । এখানে কোম বলতে একই রক্তধারার জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কোম প্রথায় সদস্যদের মধ্যে একাত্মতার অনুভূতি অতি প্রবল। বাংলায় এবং বিশেষ করে আমাদের আলোচ্য জেলার অন্তস্থিত স্থানসমূহে আর্য আগমনের প্রাক্কালে যেসব আদিবাসি বাস করতো তারা ভিন্ন ভিন্ন রক্তধারার জনগোষ্ঠী ছিল। সে সময় নগরায়ণের প্রক্রিয়া তেমনভাবে শুরু হয়নি ফলে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা অঞ্চলে এক কোমের লোকজন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করতো এবং অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাতে তারা একজন অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না। আর্যদের বসতি স্থাপনের পূর্বে এই অঞ্চলে অনেক কোমের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করা যায়। এসব কোম বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল। পুন্ড্র একটি শক্তিশালী কোম হিসাবে বিবেচিত হতো এবং আর্যরা তাদের শক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে প্রথমে তাদের দস্যু বলে অভিহিত করেছেন এবং পরে আন্তঃবিবাহের মাধ্যমে তাদের সাথে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। শবর ও পোড, কোম এ অঞ্চলে বাস করতো। তবে পরবর্তীতে এ অঞ্চল থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে বলে জানা যায়। কোচ, মেচ ও সারু ভিন্ন ভিন্ন কোম হিসেবে রাজশাহী জেলার আওতাভুক্ত বিভিন্ন স্থানে বাস করতো। সাম্প্রতিককালে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে যেসব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এসব কোমের ভিতর বিবাহ ও আহার-বিহারগত, ধর্ম ও আচারগত নানা প্রকার বিধি নিষেধ বিদ্যমান।২৩ এক কোমের

সাথে অন্য কোমের নর-নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতো না, বরং এ ব্যাপারে প্রত্যেক কোম স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতো। এসব কোম সাধারণভাবে স্পিরিট ও অদৃশ্য শক্তিকে ভয় করতো, এবং যে জীব ও জড় পদার্থের মধ্যে সে শক্তির প্রকাশ ঘটতো তারা তার উপাসনা করতো।

হিন্দু বর্ণ বিন্যাসের ব্যাপারে বলা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে আর্য জাতির মধ্যে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। প্রথমে সকল জাতির মধ্যে আহার-বিহার, উপবেশন ও মেলামেশা প্রচলিত ছিল। সমাজের কাজকর্ম সুচারুভাবে চালাবার জন্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চার শ্রেণীতে আর্যজাতি বিভক্ত হয়। ব্রাহ্মণ, যাগযজ্ঞ ও পৌরহিত্য, ক্ষত্রিয়, যুদ্ধবিদ্যা ও দেশরক্ষা, বৈশ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ এবং শূদ্র এই তিন শ্রেণীর লোকদের সেবা ও দাসবৃত্তিমূলক কাজে নিয়োজিত থাকতো। বৈদিক রীতিনীতি অনুযায়ী তারা পারস্পরিক সৌহার্দ ও সহ অবস্থানের বিধি মেনে চলতো। এমনকি তাদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ দোষণীয় বলে বিবেচিত হতো না। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুদের মধ্যে বৈদিক অনুশাসনের বিচ্যুতি ঘটে এবং সুবিধা অনুযায়ী তারা নানা আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন করে। এভাবে তারা জাতিভেদ প্রথার প্রাচীর তুলে হিন্দু সমাজকে অস্পৃশ্যতার অশুভ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে । কথিত আছে যে, রাজা বল্লাল সেন (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী) হিন্দুদের মধ্যে সদগুণের স্বভাব লক্ষ্য করে সংস্কারমূলক কিছু বিধি প্রবর্তন করেন এবং হিন্দুদের কৌলিন্য প্রথা তার একটি উদাহরণ। বল্লাল সেন ব্যক্তিগত সদগুণ ও সুআচরণকে কৌলিন্যের মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং অকুলীনদের সাথে কুলীনদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নীতি-বহির্ভূত বলে গণ্য করেননি। ভাল ব্যবহার, নম্রতা, প্রজ্ঞা, খ্যাতি, পবিত্র স্থান দর্শনের প্রতি আকর্ষণ, নিষ্ঠা, শান্তি, সংযম ও বদান্যতা-এই নয়টি গুণ কৌলিন্যকে নির্ধারণ করার জন্যে উদ্ভাবিত হয়েছে।২৪ এইসব গুণের সংখ্যা, আনুপাতিক হার এবং আধিক্য ও স্বল্পতা বিচার করে কুলীনের মর্যাদা-স্তর নির্ণয় করা হতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে কৌলিন্যর মর্যাদার স্তর নির্ণয়ের ব্যাপারে সংশোধনী পেশ করা হয়েছে এবং খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে কৌলিন্য ব্যক্তিগত গুণের জন্যে বিবেচিত না হয়ে বংশানুক্রমিক আভিজাত্য হিসেবে গণ্য হয়েছে। উদায়াচার্য ভাদুরী (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী) কৌলিন্যকে

একটি বংশগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। কৌলিন্য ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে বংশগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার ফলে এ দেশের হিন্দু সমাজ বহু বর্ণ ও শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেনি। পরবর্তীকালে অকুলীন ও নিম্ন শ্রেণীভুক্ত হিন্দু তার কুফল হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

রাজশাহী জেলায় কুলীন ও অকুলীন হিন্দু বাস করতো। হিন্দুদের উচ্চ পর্যায়ে ব্রাহ্মণ গণ্য হয়ে থাকে। রাজশাহীতে পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করতো। বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বৈদিক, বর্ণ ও কনৌজ ব্রাহ্মণ হিসেবে তাঁরা তাঁদের পরিচয় দান করেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি জাতিবাচক হিন্দু এ জেলায় বাস করতো। এ ছাড়াও এ জেলায় নিম্নশ্রেণীর অনেক জাতিবাচক হিন্দুদের বাস ছিল। এসব জাতিবাচক হিন্দুদের সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং রাজশাহী জেলায় এদের সবার সন্ধান মিলে। বৈদান্তিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক বলে তাদের পরিচয়। বৈদান্তিক হিন্দুরা পুরাকালের হিন্দুদের অনুসারী এবং আচার অনুষ্ঠানে কৃত্রিমতা তারা বর্জন করে চলে। এদের সংখ্যা খুব কম এবং হিন্দু সমাজে এরা খুব সম্মানিত। রাজশাহী জেলার অধিকাংশ হিন্দু পৌরাণিক মতাবলম্বী। এরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। এই বৈষ্ণব মতাবলম্বীরা দুই ভাগে বিভক্ত-পাশাচার এবং যোত্যাচার। পাশাচারেরা আমিষভোজী এবং এ কারণে তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হয়। যোত্যাচারেরা নিরামিষভোজী, এবং এদের পাঁচটি শাখা আছে-গীর, ভারতী, নাড়া, বাউল ও দরবেশ। এদের মধ্যে গীর ও ভারতীর মতে স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং সাংসারিক কার্যে মনোনিবেশ করা সমীচীন নয়। কিন্তু কার্যত এরা গোপনভাবে স্ত্রীলোকদের সাথে যৌনাচার করে থাকে এবং অর্থোপার্জন করে থাকে। নাড়া ও বাউল সম্প্রদায় বৈরাগী বলে খ্যাত এবং এরা চৈতন্য দেবের শিষ্য। এরা চৈতন্য দেবকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করে। এ দু'সম্প্রদায়ের নর-নারী অবাধ মেলামেশা করে এবং অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। দরবেশরা ভিক্ষুক, কিন্তু তারা চৈতন্য দেবকে বিষ্ণুর অবতার বলে অর্চনা করে না।

বেদে নিরাকার স্রষ্টার ধ্যান, মনন ও আরাধনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোকের সুবিধার্থে বেদের সার নিয়ে তন্ত্রসমূহের সৃষ্টি হয়ে আগমোক্ত কার্যের

বিধান হয়েছে। প্রকৃত তান্ত্রিক শক্তিকে পরব্রহ্ম জ্ঞানে উপাসনা করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, স্রষ্টার ধ্যান না করে তান্ত্রিকেরা মূর্তির পৌত্তলিকতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে এবং জড় পদার্থও পূজা করতে থাকে। এর ফলে হিন্দু ধর্মাচারে অনাচার সৃষ্টি হয় এবং বিপথগামী জাতি হিসেবে তারা চিহ্নিত হয়। বিভিন্ন পার্বণে বিগ্রহ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা অর্চনা ও নৃত্য-গীত পরিবেশন করা হিন্দুদের ধর্ম পালনের প্রধান রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে কালীপূজা, শিবপূজা, দূর্গাপূজা, লক্ষীপূজা ও সরস্বতীপূজার মন্ডপ ও থান নির্মিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধর্মানুষ্ঠান ও নৈতিকতা

বিগ্রহ ও মূর্তিপূজা হিন্দুদের আরাধনা অর্চনার মুখ্য বিষয় বলে গণ্য হতো। প্রাক-মুসলিম আমলে শিলাখন্ডের দ্বারা বিভিন্ন কল্পিত দেব-দেবীর প্রতিকৃতি নির্মাণ করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হতো, এবং হিন্দুরা এসব বিগ্রহের বেদীমূলে অর্ঘ্য দান করতো। এ জেলায় যেসব কোম বাস করতো তাদের মধ্যে পুন্ড্র, শবর, গোড, কোচ, মেচ, রাজবংশী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব কোম ও আদিবাসীর পূজা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস ও সংস্কার হিন্দুদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আদিবাসী ও কোমদের শীতলা, মনসা, বনদূর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকার চন্ডী, নরমুন্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি দেব-দেবীরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেছে বলে মনে হয়। এভাবে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, শিব ও শিবলিঙ্গপূজা, লক্ষী ও স্বরস্বতীপূজা হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে পৌত্তলিকতার শিকড় শক্ত করে তুলেছিল এ অঞ্চলের শহর ও গ্রামগঞ্জে। এসব অনুষ্ঠানে নারীদের নৃত্য-গীত এবং কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি দর্শকদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির পরিবর্তে যৌনলিপ্সাকে শাণিত করে তুলেছিল। ফলে ধর্মের নামে নর-নারীর গোপন অভিসার ও দেহদানের কারণে হিন্দু সমাজ পঙ্কিলে ডুবে পড়েছিল। পরকীয়া প্রেম না হলে সিদ্ধিলাভ হয় না-এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নারীরা

যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে হিন্দু সমাজে অবাধ যৌন সম্ভোগের পথ কন্টকমুক্ত করেছিল। এরূপ আচরণ কোন সুস্থ সমাজের জন্যে কাম্য হতে পারে না।

প্রাক-মুসলিম আমলে হিন্দু সমাজ জরাগ্রস্ত এবং নৈতিক অবক্ষয়ের শক্ত শিকলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এক দিকে জাতিভেদ প্রথা সমাজের সাধারণ জনজীবনকে ছুঁৎমার্গের অভিশাপে বিদ্ধ করে ফেলেছে, অপর দিকে সমাজের উপর তলার বিলাসবহুল জীবন পাপাচারের প্রবৃদ্ধি করে চলেছে। এসব পাপাচারকে অধিক ক্রিয়াশীল করার লক্ষ্যে গৃহে ও মন্দিরে দেবদাসী প্রথা বিস্তার লাভ করে। নৈতিক অবক্ষয়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হিন্দু সমাজ ও রাষ্ট্র-কাঠামো মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে এক বিরাট ধ্বংসের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তার স্পর্শ লেগেছিল আমাদের আলোচ্য এই ভূখন্ডে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রয়াত নিহার রঞ্জন রায় সে সময়ের হিন্দু সমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। তিনি লিখেছেন, "ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচারানুষ্ঠানকে নানা প্রকার যৌনাতিশয্যে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল। বোধ হয় তাহারই ফলে উচ্চবর্ণ ও শ্রেণীগুলিতে নানা প্রকারের কাম ও যৌন-বিলাস দেখা দিয়াছিল। বস্তুত, যৌন আচার-ব্যবহারে কোন প্রকার শীলতাজ্ঞান এই সময় সমাজে ছিল বলিয়া মনে হয় না। নাগর সমাজের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে ব্যক্তিগত উপভোগের জন্যে দাসী রাখা নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। আর সেন আমলেই দেবদাসী প্রথা বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। বিজয় সেন ও ভট্টদেব দুইজনই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম মন্দিরে শত শত দেবদাসী উৎসর্গ করিবার গৌরব দাবি করিয়াছেন। মন্দিরে দেবদাসীর উল্লেখ ধোয়ী-কবির পবনদূত কাব্যে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতেও দেব বারবনিতার উল্লেখ সুস্পষ্ট। সমসাময়িক বাংলার নাগর সমাজের যুবক-যুবতীদের যে কামলীলার বিবরণ ধোয়ী কবির পবনদূতে পাওয়া যায় তাহাও খুব প্রশংসনীয় নয় অথচ, কবি তাহাকে সাধারণ সমাজ জীবনের অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শুদ্র নারীকে বিবাহ করিতে পারিত না, কিন্তু শুদ্র নারীর সঙ্গে

বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোন বাধা ছিল না, নামমাত্র শাস্তিতেই সে অপরাধ কাটিয়া যাইত-ইহাই সমসাময়িক বাংলার স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান। বিলাস ও আড়ম্বরাতিশয্যও এই সময় নাগর সমাজকে গ্রাস করিয়াছিল।---সঙ্গে সঙ্গে যৌনাতিশয্য ও কাম বিলাস জনসাধারণের ধর্মানুষ্ঠানকেও স্পর্শ করিয়াছিল। শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় দশমী তিথিতে শাবরোৎসব, [illegible] হোলক (হোলী) এবং চৈত্র মাসে কাম-মহোৎসবেও যৌন-অধগতি সূচক নানারূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। কাল-বিবেক গ্রন্থে বলা হইয়াছে, কাম-মহোৎসবে নানা প্রকার যৌন অঙ্গভঙ্গি এবং জুগুপ্সিতোক্তি করিয়া নৃত্যগীত করিলে কাম-দেবতা প্রীত হন, এবং তাহার ফলে ধনেপুত্রে লক্ষী লাভ হয়। ইহাই ছিল সমসাময়িক কালের বিবেক।"২৫ এই উদ্ধৃতি থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে; প্রাক-মুসলিম আমলে রাজশাহী জেলার অধিভুক্ত ভূখন্ডসহ বাংলার সমাজ জীবন নৈতিক অবক্ষয়ের শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছিল। রাষ্ট্র ও প্রশাসন যন্ত্র নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। সমাজ বহু স্তরে, উপস্তরে বিভক্ত, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা অধোগামী, নীতি নৈতিকতা জরাগ্রস্ত, রাজা-অমাত্যেরা বিলাসপরায়ণ ও মদিরাসক্ত এবং ক্ষাত্রশক্তি হীনবল হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় কোন উত্তম জীবন নীতির অনুপ্রবেশ এবং বর্হিআক্রমণের প্রতিরোধ ক্ষমতা রাজা, অমাত্য ও উচ্চশ্রেণীর কারো ছিল না। সাধারণ জনগণ তাই মুসলমান আগমনকে স্রষ্টার আশির্বাদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে নিহার রঞ্জন রায়ের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য-"একদিকে উত্তর ভারতের অধিকাংশ যখন মুসলমানদের করতলগত, উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতে যখন রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রায় নৈরাজ্য বলিলেই চলে, তখন বাংলাদেশের রাজ্য ও সমাজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন, স্তরে, উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ সীমায় বিভক্ত ; রাজসভা চরিত্র ও আত্মশক্তিহীন ; ধর্ম ও সমাজ বিলাস লালসায় ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত ; শিল্প ও সাহিত্য বস্তু সম্বন্ধ বিচ্যুত ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছাসময় অত্যুক্তি, আলঙ্কারিক আতিশয্য এবং দেহগত লীলা বিলাসে ভারগ্রস্ত, জনসাধারণের দেহমন

বৌদ্ধ বজ্রযান–সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য–ডাকিনী–যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড তূকতাকে পঙ্গু, উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ। বখ্‌ত–ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়–রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম মাত্র।"[২৬] এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের উদারতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহনশীলতা, সাম্য ও উন্নত জীবনাদর্শ এ অঞ্চলের নিপীড়িত জনগণকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল এবং সে জন্যেই এদেশের মাটিতে ইসলাম অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

---

১. দিলীপ কুমার বিশ্বাস, 'অর্য", ভারতকোষ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৫৫।

২. ভারত কোষ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৫৩।

৩. রাখাল দাস বানার্জি, বাংলার ইহিস, প্রথম খন্ড (কলকাতাঃ নব ভারত প্রকাশ, ১৯২৪), পৃঃ ২৫।

৪. R.C. Majumdar (ed.), *History of Bengal*. Vol. I (Dhaka : Dhaka University, Ist edition, 1943). P. 395.

৫. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অধ্যায় ৭, শ্লোক ১৮।

৬. গৌরি নাথ শাস্ত্রী, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (কলিকাতাঃ স্বারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১–৪।

৭. মহাবারত, আদি পর্ব, অধ্যায় ১০৪, শ্লোক ৯–৫৫ ; বায়ু পুরাণ, অধ্যায় ৯৯, শ্লোক ২৬–৩৪ ; মৎস পুরাণ, অধ্যায় ৪৮, শ্লোক ২৩–২৯।

৮. গৌরি নাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯, ৩৬।

৯. F.E. Pargiter, " Ancient Countries in Eastern India", *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (Henceforth JASB), Vol. LXVI, 1897, P. 101;

ইতিহাস (বাংলাদেম ইতহাস পরিষদ পত্রিকা) বৈশাখ–চৈত্র, ১৩৮৫, পৃঃ ২৩ ।

১০. R. C. Majumdar (ed.), *History of Bengal*, Vol. I (Dhaka: Dhaka University, 1943). P.7 (Henceforth the source is referred to as *HB)*.

১১. Puspa Niyogi, *Brahmanic Settlements in Different Sub-Divisions of Ancient Bengal* (Calcutta: Indians Studies, Past & Present, 1967). p.19.

১২. গৌড়ের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃঃ ৬১ ।

১৩. মিনহাজ সিরাজ, তবাকাত–ই–নাসিরী, ১ম খন্ড (কাবুল ঃ আফগানিস্তানের ইতিহাস সোসাইটি, ১৯৬৩) পৃঃ ৪২৭।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৭।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৭।

১৬. E.A. Gait, *Census of India*, Vol. IV, Part I, pp. 139, 399 ; আবদুস সাত্তার, অরণ্য জনপদ (ঢাকাঃ জনী বুকস, ১৯৬৬), পৃঃ২২৬।

১৭. Thomas Walters, *On Yuan Chawang's Travels in India*, Vol. II (London : Royal Asiatic Society, 1965), P. 184.

১৮. K.N. Dikshit, "Paharpur Copper-plate Grant of the Gupta Year 159", *Epigraphia Indica*, Vol. XX, pp. 59 ff.

১৯. Thomas Walters, *Yuan Chwang's Travels*, Vol.II, p. 18

২০. A.K.M. Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Barind*, 1200-1576 (Unpublished Ph. D. Thesis), P. 182.

২১. রামাই পন্ডিত, শূণ্য পরাণ, সম্পাদনা নগেন্দ্র নাথ বসু(কলিকাতা ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ), পৃ ১৪।

২২. প্রাগুক্ত

২৩. নিহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব (কলিকাতা ঃ লেখক সমবায় সমিতি, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১২৭।

২৪. Sudhir Ranjan Das, "Some Aspects of the 19th Century Bengali Society" J. N. *Banerjee Volume*, Department of Ancient Indian History and Culture, University of Calcutta, 1960, P. 271.

২৫. নিহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭২–২৭৩।

২৬. বাঙালীর ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম যুগ ও ইসলাম প্রচারের ধারা

বাংলায় ইসলাম প্রচার ও সমাজের উপর তার প্রভাব

একটি অঞ্চল বা পরবর্তীতে জেলারূপে আখ্যায়িত কোন ভৌগোলিক বিভাজনে ইসলামের আগমন প্রসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতে হলে সামগ্রিক বাংলায় ইসলাম প্রচারের পর্যায়ক্রমিক ধারা ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে। এ জন্যে রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচারের পটভূমি ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে বাংলার সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ এবং জনগোষ্ঠীর সমাজ-জীবনের উপর তাঁদের প্রভাব নিরূপণের প্রয়াস পাব।

পৃথিবীর যে কোন অংশে আল্লাহ্ পাকের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে সমষ্টিগতভাবে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে এক বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে ইসলামে বিবেচিত হয়েছে। মহানবী (সা) বলেছেন, 'আমার নিকট হতে একটি বাক্য শুনে থাকলে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেবে।' 'উপস্থিত ব্যক্তি আমার নিকট থেকে যা শুনবে তা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট অবশ্যই প্রচার করবে।'[১] মহানবীর (সা)-এর এই নির্দেশে সাহাবা কিরাম থেকে শুরু করে পরবর্তী অনুসারিগণ পালন করার চেষ্টা করেছেন এবং তার বাস্তব উদাহরণ আমাদের জন্যে রেখে গেছেন। মহনবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ধারা তাঁর নির্দেশিত পথে মুসলমানগণ অব্যাহত না রাখলে ইসলাম আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তো এবং বিশ্বের দিগ্‌দিগন্তে ইসলামের বিজয় কেতন উড়ত না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা) ভারত বিজয়ের জন্যে তাঁর অনুসারীদের উৎসাহিত করেছেন।

ভারত অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে মহানবী (সা) বিজয়ের আশার বাণী শুনিয়েছেন।[২] এ জন্যেই লক্ষ্য করা যায় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে ভারতে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি চলেছে। কথিত আছে যে, ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের খিলাফতকালে নৌবহর সিন্ধুর বন্দরে নঙ্গর করেছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে উমাইয়া খলীফা প্রথম ওয়ালীদের শাসনামলে (৭০৫–৭১৫ খৃঃ) ৭১২ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলমানগণ ভারতের সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চল দখল করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ধারার প্রথম পর্যায় এ সময় হতে গণ্য করা যায়। গযনীর সুলতান মাহমুদের (৯৯৭–১০৩০ খৃঃ) সতের বার ভারত অভিযান এই উপমহাদেশে মুসলমানদের সংস্পর্শের দ্বিতীয় পর্যায় বিবেচনা করা হয়। এই পর্যায়ে ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদের আগমনের প্রভাব পড়েছিল। ভারতের পূর্বদিকে কনৌজ এবং দক্ষিণ দিকে গুজরাটের সোমনাথ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদের অভিযান পরিচালিত হওয়ার ফলে এসব অঞ্চলের জনগণ মুসলিম সংস্কৃতি ও জীবনধারার সাথে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পায়। তবে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জনগণ সাধারণভাবে ইসলামের ব্যাপক কর্মসূচী সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারেনি। ঘুর বংশীয় মুইযউদ্দীন মুহাম্মদ বিন সাম (যিনি মুহাম্মদ ঘুরী নামে সমধিক পরিচিত) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খৃঃ) চৌহান রাজ পৃথ্বিরাজের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে এই উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে এই উপমহাদেশে মুসলমান আগমনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই পর্যায়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার লাখনাবতীতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বাংলায় স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলার সাথে তাঁদের কার্যকর কোন সংযোগ সাধিত হয়নি। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে সুলতান মাহমুদের পুনঃপুনঃ ভারত অভিযান পরিচালানার ফলে তুর্কী মুসলমানদের সামরিক অভিযানের আশংকা বাংলার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এসে পৌছেছিল।[৩] তৃতীয়

পর্যায়ে তুর্কী সামরিক অভিযান বাংলার বিরুদ্ধে পরিচালিত হলে এখানে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা পরবর্তীকালে বাংলায় স্বাধীন সালতানাতের গোড়াপত্তন করে।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলার উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলের লাখনাবতীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম প্রশাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বাংলার সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে বিভিন্ন অবস্থা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ব্যবসা–বাণিজ্যের সূত্রে বাংলায় মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল। এই পর্যায়ে উলামা, মাশায়েখ ও সূফী–সাধকরা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে জনগণের মধ্যে ইসলামের তাওহীদী দাওয়াত পেশ করেছেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে আরবের মুসলমানরা প্রাচ্য, বিশেষ করে চীনের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক সুসংহত করেছিলেন।[৪] প্রাথমিক যুগের আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ হতে জানা যায় যে, আরবের বণিকগণ চীনের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে জাহাজের জ্বালানি সংগ্রহের জন্যে চট্টগ্রাম বন্দর, আরাকান এবং বার্মায় যাত্রা বিরতি করেছেন।[৫] এইসব বণিকদের সাথে ইসলাম প্রচারকগণ এসেছেন এবং তাঁরা সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাঁদের প্রচার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি এইসব ব্যবসায়ীর অনেকেই ইসলামী অভিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁরাও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বন্দর ও উপবন্দরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে তাঁরা সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন তাঁদের আমল ও চারিত্রিক গুণাবলীর সংস্পর্শে এসে এ দেশের সাধারণ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। বহিরাগত মুসলমানরা স্থানীয় নওমুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে মুসলিম সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। সম্ভবত খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হতে সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর ও বন্দরে ইসলামের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচিতির এই ধারা শুরু হয়।[৬] তাহলে ধরে নেয়া যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে সমুদ্র পথে বাংলার সাথে ইসলামের পরিচিতি ঘটে, মুজাহিদ ও সূফী–সাধকগণ শিরক ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলে সুবিধাভোগী ও

অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও সামন্তদের সাথে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা শাহাদতবরণ করেন। সমুদ্র পথে প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব মুজাহিদ ও সূফী-সাধক বাংলায় এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আরব ও পারস্য বংশোদ্ভূত।

ইখতিয়ার উদ্দীনের বিজয়ের পূর্বে স্থলপথে বাংলার মধ্য ও পুরাভূমির সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না। বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তেলিয়াগড়হী পথ দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করা যেত। এই স্থলপথ দিয়েই আর্য থেকে শুরু করে বিদেশী আক্রমণকারিগণ বাংলায় প্রবেশ করেছে। কারণ বাংলার উত্তরে হিমালয় পর্বত, গোটা পশ্চিমাঞ্চল সমুদ্র পর্যন্ত ঘন জঙ্গল (ঝাড়খন্ড হিসেবে পরিচিত) এবং দক্ষিণে সমুদ্র প্রবাহিত হয়ে বাংলার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করেছে। বাংলায় প্রবেশের জন্যে স্থলপথ হিসেবে উত্তর বিহারের দারভাঙ্গাকেও উল্লেখ করা যায়। তবে এ পথ গমনাগমনের জন্যে তেমন সুবিধাজনক ছিল না। কারণ পুনর্ভবা, মহানন্দা ও গঙ্গার ত্রি-ধারা পার হয়ে তবে বাংলার মধ্য ভূমিতে প্রবেশ করা যেত। বর্তমানের পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলায় এই তেলিয়াগড়হী (রাজমহল পাহাড় হয়ে) গিরিপথ অবস্থিত। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে এই স্থলপথ দিয়ে বাংলার মধ্য ও পুরাভূমির সাথে সূফী-সাধকের মাধ্যমে ইসলামের কোন পরিচিতি ঘটেছিল কিনা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রামাণ্য তথ্য উপস্থাপন করা যায় না। সমুদ্রোপকূল হতে দূরত্বের কারণে বাংলার মধ্য ভূমির সাথে আরব বণিকদের কোন যোগাযোগ ঘটেনি। তবে উপাখ্যানের সূত্র ধরে বলা যায় যে, বগুড়ার মহাস্থানে মাহমূদ মাহী সওয়ার,[৭] শেরপুরে শাহ তুরকান [৮], পাবনার শাহজাদপুরে মখদুম শাহ দাওলা শহীদ [৯] এবং শেকশুভোদয়ে বর্ণিত লাখনাবতীর লক্ষণ সেনের দরবারে আগত মখদুম শাইখ জালাল উদ্দীন তাবরীযী [১০] বাংলার পুরাভূমি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুসলমানদের সামরিক বিজয়ের পূর্বে ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার হতে আব্বাসীয় খলীফা হারুন-উর-রশীদের মুহাম্মদী টাঁকশালের (১৭২ হিজরী ৭৮৮ খৃষ্টাব্দের আবিষ্কৃত) একটি দিরহাম [১১] বা রৌপ্য মুদ্রার সাক্ষ্যে কোন কোন পন্ডিত এই অভিমত পোষণ

করেন যে, বাংলার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে অষ্টম শতাব্দীতে ইসলাম প্রচারক পদার্পণ করেছিলেন।[১২] এই অভিমত বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। সুলাইমান আত-তাজিরের সিলসিলাতুত তাওয়ারীখে বর্ণিত মূলকে রুহমী বা দারহামীকে যদি ধর্মপালের সাম্রাজ্যের সাথে সনাক্ত করা হয়।[১৩] তাহলে এটি অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, ধর্মপালের রাজত্বকালে (৭৭০-৮১০ খৃঃ) মুসলিম ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারকগণ এই অঞ্চলে এসেছিলেন। এইসব উৎসের ভিত্তিতে বলা যায় যে, খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হতে ব্যবসা অথবা ইসলাম প্রচারের সূত্রে সমুদ্রোপকূল অঞ্চলের ন্যায় বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথেও মুসলমানদের পরিচয় ঘটেছিল। এটি বাংলায় ইসলাম প্রচারের ধারায় প্রারম্ভিক পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের ধারা দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর হতে এবং এই পর্যায়ে মুসলিম শাসক ও সুলতানগণের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলার লাখনাবতীতে শাসন প্রতিষ্ঠার পর সে স্থানে এবং তাঁর বিজিত ভূখন্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৪] তাঁর খলজী প্রশাসকগণও তাঁর এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন।[১৫] বাংলার পরবর্তী স্বাধীন সুলতানদের আমলে এই কার্যক্রম অধিক গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়িত হয়েছে। শিলালিপি ও সমসাময়িক লিখিত উৎস হতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। হুগলী জেলার ত্রিবেনীতে বাংলার শাসক রুকনউদ্দীন কাইকায়সের শাসনকালে (১২৯১-১৩০১ খৃঃ) ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি মাদ্রাসা[১৬] এবং শামসউদ্দীন ফিরুয শাহের আমলে (১৩০১-১৩২২ খৃঃ) ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল খায়রাত নামে আর একটি মাদ্রাসা [১৭] ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (সাতগাঁ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত) শিক্ষার দীপশিখা জ্বালিয়ে জনগণের নিকট ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রচার করা অব্যাহত রেখেছিল। অনুরূপভাবে বাংলার উত্তর পশ্চিম বা লাখনাবতী অঞ্চলে সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলের (১৪৭৪-১৪৮১ খৃঃ) দরসবারী মাদ্রাসা [১৮], আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলের (১৪১৩-১৫১৯ খৃঃ) বেলবারী মাদ্রাসা [১৯] এবং নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহের

আমলের (১৫১৫-১৫৩১ খৃঃ) বাঘা মাদ্রাসা ২০ ইসলাম প্রচার ও শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হতো। ছাত্রগণ বিনা খরচে পড়াশুনার সুযোগ পেত, এবং উলামা, মাশায়েখ এবং শিক্ষকগণ মদদ-ই-মা'শ হিসেবে ইকতা ও লাখারাজ ভূমি লাভ করতেন। এমনিভাবে জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ব্যাপক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল। বাংলার শাসক ও সুলতানগণ শিক্ষা বিস্তার ও ইসলাম প্রচারের জন্যে যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের ধারায় তৃতীয় পর্যায়ে প্রসিদ্ধ আলিমগণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত মাদ্রাসা এবং ওয়াইয বা প্রসিদ্ধ বক্তাগণের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই পর্যায়ে রাজশাহী জেলার মাহীসন্তষে মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা[২১] এবং ঢাকা জেলার সোনারগাঁতে মাওলানা শরফউদ্দীন আবূ তাওয়ামা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা[২২] শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল তা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না। বাংলার পূর্বাঞ্চলে (যা সে সময় সোনারগাঁ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল) আবূ তাওয়ামার মাদ্রাসা ইসলামী শিক্ষাদানে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল। যেসব আলিম তাঁদের বক্তৃতা দ্বারা জনগণকে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলাউদ্দীন আলী মর্দান খলজীর শাসন আমলের কাযী রুকনউদ্দীন সমরকন্দী ২৩ এবং গিয়াসউদ্দীন ইওয়ায খলজীর শাসন আমলে পারস্যের ফিরুযকোহের অধিবাসী জামালউদ্দীনের পুত্র ইমামজাদা জালালউদ্দীনের[২৪] নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিককাল হতে ওয়াইয ও হক্কানী আলিমগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

উলামা, মাশায়েখ ও সূফী-সাধকগণ বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে পন্ডিতগণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং তাঁদের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা থেকে জ্ঞানকোষে নতুন নতুন তথ্যের সংযোজন ঘটছে। বাংলার সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মুসলমানদের আগমনের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণবাদ হিন্দুদের নিপীড়ন ও

নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল। সমাজ জীবন অস্পৃশ্যতার অভিশাপে কলুষিত হয়ে পড়েছিল। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ নিষ্ক্রিয়তার শিকলে বাঁধা পড়েছিল। ভোগ বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতা শাসকগোষ্ঠী ও সমাজপতিদের মন মানসে শিকড় গেড়ে বসেছিল। ফলে বাংলার আপামর জনগোষ্ঠী এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের বেড়াজাল হতে মুক্তি লাভের জন্যে কোন আদর্শের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল! এই পর্যায়ে বাংলার সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ বাণিজ্য অথবা প্রচারের সূত্রে বাংলার সাধারণ মানুষের নিকট আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দেয়, রামাই পন্ডিত তাঁর শূণ্য পুরাণে বাংলায় মুসলমানগণের আগমন বিশ্বপ্রভুর এক মহা আশীর্বাদরূপে চিত্রিত করেছেন।[২৫] ইসলামের শাশ্বত জীবন-বিধান এবং প্রচারক মুসলমানদের নিষ্কলুষ চরিত্র, অমায়িক আচরণ ও পূত জীবনধারা এ দেশের নিপীড়িত জনগণকে এক সার্বজনীন আদর্শের দিকে আকর্ষণ করেছিল। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও একাত্মতার নীতি অসাম্য ও অস্পৃশ্যতার শিকলে বাঁধা নিম্নবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিগণকে ইসলামী জীবনবোধের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাই তরবারির ভয়ে নয়, বরং ইসলামের আদর্শ জীবন দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ দেশের জনগণ অধিক সংখ্যায় সানন্দ চিত্তে ইসলাম কবূল করে সামাজিক বৈষম্য নিরসনে এগিয়ে এসেছে এবং পারলৌকিক কল্যাণ ও পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেয়েছে। এ দেশের মানুষের মন-মানসে ইসলাম তাই এক স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। ইসলাম প্রচারের ধারার উপর সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার আলোকে রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচার ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব।

রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচারের ধারা, কার্যক্রম ও অগ্রগতি

রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় সূফী-সাধকগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। উপাখ্যান ও কিংবদন্তীর সূত্রে এ সম্পর্কে কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোর ঐতিহাসিকতা নিয়ে পন্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর লাখনাবতী বিজয়ের পূর্বে রাজশাহী জেলার আওতাভুক্ত কোন এলাকায়

উলামা, মাশায়েখ ও সূফী–সাধক ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য তথ্য আমাদের নিকট নেই। পরবর্তীকালের শিলালিপির সূত্রে কিছু আলিম ও সাধক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে ধরে নেয়া হয়। মুসলিম শাসনামলে রাজধানী শহর রাজশাহী জেলার সংলগ্ন হওয়ার কারণে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এখানে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। সমাজ গঠনে ইসলামী জীবনবোধ ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কিছু ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।

হযরত শাহ মখদুম

রাজশাহী শহরের দরগাহপাড়া মহল্লায় হযরত শাহ মখদ্রমের মাকবারা বা সমাধি–সৌধ অবস্থিত। সমাধি–সৌধের প্রবেশ পথের উপরি অংশে একটি শিলালিপি আছে এবং তাতে নির্মাতা ও কবরে শায়িত ব্যক্তির পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই শাহ মখদুমের ঐতিহাসিক ব্যক্তি হওয়ার মধ্যে যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় । তবে তাঁর পরিচিতি ও সনাক্তকরণ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উপাখ্যান ও সাম্প্রতিককালের তাঁর জীবনী সম্পর্কে মূল ফারসী হতে বাংলা ভাষায় অনুদিত একটি গ্রন্থের সূত্রে বলা যায়, শাহ মখদুম বাগদাদের শায়খুল মাশায়েখ হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ)–এর একজন বংশধর ছিলেন।[২৬]

কথিত আছে যে, বর্তমান রাজশাহী শহর পূর্বে মহাকালগড় হিসেবে পরিচিত ছিল এবং তা ‘দেও’ বা ‘দেব’ উপাধি বিশিষ্ট কোন তান্ত্রিক রাজার রাজধানী শহর ছিল। রামপুর তখন রাজশাহীর অপর নাম হিসেবে বিবেচিত হতো। এই দেব রাজ্যের তান্ত্রিক রাজা অংশুদে ও চান্দভন্ডী বর্মাভোজ ও তার ভ্রাতা অংশুদেও খেজ্জুর চান্দ খড়গ বর্মাগুজ্জভোজ দেবতার সন্তুষ্টির জন্যে নরবলি দিত।[২৭] এই তান্ত্রিক শাসক অত্যাচারী ছিল। প্রজাগণ তার অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। এই তান্ত্রিক শাসক সম্ভবত রাজশাহী অঞ্চলের একজন সামন্ত রাজা ছিল এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সে এখানে শাসন করতো। এ সময় শাহ তুরকান কিছু সংখ্যক অনুসারী নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে রাজশাহীতে আসেন।

কারণ এর পূর্বে তান্ত্রিক রাজা রাজশাহীতে আগত কিছু মুসলমানকে ধরে দেব মন্দিরে বলি দিয়েছে। ইসলাম প্রচার ও জালিম শাসকের হাত থেকে জনগণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে শাহ তুরকান এখানে আসেন। শাহ তুরকান ও দেব রাজার মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে শাহ তুরকান শাহাদতবরণ করেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ১২৮৮ খৃষ্টাব্দের দিকে। তান্ত্রিক রাজার এই মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের প্রতিবিধান করার উদ্দেশ্যে শাহ মখদুম (রাহ) তাঁর শিষ্য ও অনুচরসহ বাগদাদ থেকে সমুদ্র পথে নোয়াখালির শামপুর হয়ে রাজশাহীর বাঘা নামক স্থানে প্রথম উপনীত হন। এ স্থানের নামকরণ হয় মখদুম নগর।[২৮] এরপর তিনি রামপুর বোয়ালিয়া এসে তান্ত্রিক রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাওহীদের অমিয় বাণী জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয়, শিরকের মূল উৎপাটিত হয়, নরবলি প্রথার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সাম্য, প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের শিক্ষা জনমনে স্থিতি লাভ করে। ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে শাহ মখদুমের আগমনের তারিখ নির্ণয় করা হয়।[২৯] তিনি তাঁর প্রচার কার্যে সাফল্য অর্জন করেন এবং মুসলিম সমাজ গঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে খানকাহ স্থাপন করেন। তিনি ৭১[illegible] হিজরীর ২৭শে রজব/১৩৩১ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন[৩০] এবং বর্তমান রাজশাহী শহরের দরগাপাড়া মহল্লায় সমাহিত হন। পরবর্তীকালে মির্জা আলী কুলী বেগ কর্তৃক ১০৪৫ হিজরী/১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর সমাধির উপর এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রাকার সমাধি–সৌধ নির্মিত হয়।[৩১] প্রত্যেক বছরের ২৭শে রজব তারিখে শাহ মখদুমের মাজারে তাঁর বার্ষিক ইছালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।

এই মহান সাধকের নাম শাহ মখদুম জালালউদ্দীন রুপোশ অথবা মখদুম আবদুল কুদ্দুস রুপোশ। রাজশাহীতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর আগমনের তারিখ নিয়ে আধুনিক পন্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। দরগা সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী জনাব গোলাম আকবরের বর্ণনার প্রেক্ষিতে মরহুম ডঃ ইনামুল হক এই সূফী–সাধকের আগমনের তারিখ ১১৮৪ খৃষ্টাব্দ নির্ণয় করেছেন।[৩২] প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মরহুম শামসুদ্দীন আহমদ বিভিন্ন সূত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে শাইখ জালাউল হকের বংশধরের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজশাহীতে তাঁর আগমনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[৩৩] অধ্যাপক আবু তালিব

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁর আগমনের তারিখ নির্ধারণ করেছেন এবং ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর বছর নির্দেশ করেছেন।[৩৪] তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করেছেন এবং কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান দান করেছেন। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে কোন সূফী–সাধকের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সামন্ত কোন রাজার সাথে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়ে জয়লাভ করা সম্ভব কিনা তা প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। সে জন্যে ইনামুল হকের মত গ্রহণযোগ্য নয়। ঐতিহাসিক তথ্যের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের আলোকে শামসুদ্দীনের মতকেও গ্রহণ করা যায় না। কারণ শাইখ আলাউল হকের পৌত্র শাইখ জাহিদের কোন সন্তানের নাম শাইখ মখদুম বলে কোথাও উল্লেখ নেই। কাজেই আবু তালিবের মতকে অনেকটা গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নিয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কোন এক দশকে শাহ মখদুমের আগমন নির্দেশ করা যায়। যে শিলালিপির সূত্রে শাহ মখদুমের ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত হয়েছে তার মূল ফারসীসহ বাংলা আনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো।[৩৫]

প্রথম সারি

موفق شد بنائی گنبد قبر سید سند مرحوم مغفور
الواصل الی جوار الله شاه دربیش (روپش) - درسال
هزار پنجهجری نبوی سعادت نصاب توفیق ماب - زبدة
الاثل.

দ্বিতীয় সারি

و الاقران علیقلی بیگ - غلام علیحضرة رفیع منزلت
مقرب الحضرت العلیة العالیة الخاقانیة - یوسف اقای
خواجه سرای دستور السلاطین قانون الخواقین ذریت
سید المرسلین - السلطان.

তৃতীয় সারি

بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان
لشکر کش ایران مروج مذهب ائمه اثنا عشر- کلب
استان خیر البشر بعد از پیغمبر صلی الله علیه و اله
و امیر المؤمنین.

চতুর্থ সারি

و امام المتقین علی بن ابی طالب علیه الصلواة والسلام-
شاه عباس الصفوی الحسینی رحمة الله و لقیه نضرة
و سرورا غرض نقشیت کزما یاد ماند - که هستی را
نمی بینم بقای -

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী সম্মানিত সাইয়েদ মরহুম শাহ দরবেশ (রূপোশমুখ আচ্ছাদনকারী)–এর কবরের উপর ১০৪৫ হিজরীতে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি সৌধ আলী কুলী বেগ নির্মাণ করেন। এই ব্যক্তি মর্যাদা সম্পন্ন শাসক বংশানুক্রমিকভাবে সুলতান এবং মহানবী (সা)–এর বংশধরের উপাধিধারী ইরানের শাসক ও দ্বাদশ ইমাম মতবাদের প্রচারকারী ও সেবক। এই সম্রাট (শাহ আব্বাস) পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট মানব মহানবী (সা)–এর পরে বিশ্বাসীদের নেতা আলী বিন আবূ তালিবের সেবক ও প্রহরী হিসেবে বিবেচিত এবং আল–হুসাইনের বংশধরের মধ্যে পরিগণিত যেহেতু পৃথিবীতে কোন কিছুই স্থায়ী নয় সেহেতু তার নামকে স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্যে এই উৎকীর্ণ লিপি।

ইরানের সাফাবী সম্রাট শাহ আব্বাসের রাজত্বকালের সময়সীমা ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ হতে ১৬২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১০৪৫ হিজরী/ ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে এই লিপির উৎকীর্ণকালে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সম্রাট ছিলেন শাহজাহান। কিন্তু লক্ষণীয়

যে, সম্রাট শাহ জাহানের কোন উল্লেখ না করে আলী কুলি বেগ ইরানের সম্রাটের নাম উৎকীর্ণ করেছেন। সম্ভবত লিপিকার শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে সুন্নি মতবাদের কঠোর অনুসারী সম্রাট শাহজাহানের নাম উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেননি। ঘটনা যাই হোক এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আলী কুলী বেগ সূফী-সাধকের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেই শাহ মখদুমের কবরের উপর তার ইন্তিকালের প্রায় তিন শত বছর পর একটি সৌধ নির্মাণ করেন। এ থেকে এটি অনুমান করা যেতে পারে যে, এর পূর্বে শাহ মখদুমের স্মৃতি-নিদর্শন বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শাহ মখদুমের সমসাময়িক কিংবা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যাঁরা রাজশাহীর সংলগ্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে হযরত শাহ আব্বাস, হযরত শাহ সুলতান, হযরত শাহ করম আলী এবং হযরত দিলাল শাহ বোখারী অন্যতম। হযরত শাহ আব্বাস বাঘায়, হযরত শাহ সুলতান গোদাগাড়ীর সুলতানগঞ্জে (শাহ সুলতানের নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় সুলতানগঞ্জ), হযরত করম আলী রাজশাহী-নাটোর রাস্তার পাশে বিড়ালদহ নামক স্থানে এবং হযরত দিলাল শাহ বোখারী চারঘাটের আলাইপুর অঞ্চলে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।[৩৬] এসব আলিম ও সূফী-সাধক ব্যক্তির চারিত্রিক মাধুর্যে প্রভাবিত হয়ে জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে চির শান্তির পথের সন্ধান পেয়েছিল।

মাওলানা শাহ দাওলা

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে মাওলানা শাহ দাওলা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজশাহী জেলার বাঘায় উপনীত হন। বর্তমান রাজশাহী শহর হতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে পঁচিশ মাইল দূরত্বে বাঘা অবস্থিত। এই স্থানটি লস্করপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আইন-ই-আকবরীর বর্ণনা অনুযায়ী সরকার বারবাকাবাদের প্রশাসনভুক্ত ছিল। মাওলানা শাহ দাওলা বাঘায় সমাহিত আছেন। তাঁর প্রকৃত নাম হচ্ছে মাওলানা শাহ মুয়াযযাম দানিশমন্দ। তবে তিনি শাহ দাওলা নামে সমধিক পরিচিত। একটি বর্ণনার সূত্রে জানা যায় যে, তিনি বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-

রশীদের বংশধরের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহের (১৫১১-১৫৩১ খৃঃ) আমলে তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে বাঘায় আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শাহ আব্বাস এবং তিনি কামিল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নামের পূর্বে 'মাওলানা' এবং শেষে 'দানিশমন্দ' শব্দদ্বয় থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি ইলমে শরীয়তে একজন পূর্ণ অভিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উপরন্তু ইলমে মারিফাতে বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তিনি পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। সে সময় বাঘা মাদুমপুর বা মখদুম নগর নামে পরিচিত ছিল। তিনি মখদুমপুরের তৎকালীন প্রভাবশালী অমাত্য আলা বখ্শ বরখুরদার লস্করীর কন্যা জেবুন নেসার সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কথিত আছে যে, তিনি গৌড়ের একজন মুসলমান শাসক কর্তৃক প্রদত্ত লাখারাজ ভূমি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তা তাঁর পুত্র হামীদ দানিশমন্দ গ্রহণ করেন।[৩৭] এ সম্পর্কে যে উপাখ্যানটি প্রচলিত আছে তা হলো নিম্নরূপ ঃ

গৌড়ের একজন শাসক সামরিক অভিযানে ঢাকায় যাওয়ার সময় বাঘার নিকট যাত্রা বিরতি করে তাঁবু খাটান। এ সময় আগুনের প্রয়োজন পড়ে এবং এর জন্যে লোকজন পাঠানো হয়। এইসব লোক জঙ্গলের মধ্যে একজন ফকিরের নিকট প্রজ্জ্বলিত আগুন এবং তাঁর চার পাশে বাঘ পালকে প্রহরীরত অবস্থায় গর্জন করতে দেখতে পান। আর ফকির প্রশান্তির সাথে ইবাদত করছেন। তারা আগুন নিয়ে তাঁবুতে গমন করে সুলতানের নিকট এই খবরটি পরিবেশন করে। তিনি ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখার জন্যে ফকিরের নিকট যান এবং খবরের সত্যতা যাচাই করে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁকে অনুরোধ করে বলেন যে এই মুহূর্তে তাঁর ঢাকা যাওয়া সমীচীন হবে কিনা। ফকির তাঁকে একদিন অপেক্ষা করতে বলেন। এই ফকিরের নাম শাহ মুহাম্মদ দাওলা। ফকিরের উপদেশ মতো শাসক সেখানে একদিন অবস্থান করেন। পরদিন ঢাকা থেকে দূত এসে যুদ্ধের সমাপ্তি এবং বিজয়ের সুসংবাদ দান করেন। এতে শাসক ফকিরের কামালিয়াতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিষ্কর ভূমি প্রদান করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু পার্থিব সম্পদের প্রতি ফকির নিরাসক্তি জ্ঞাপন করে তাঁর পুত্র মাওলানা দানিশমন্দকে তা দান করতে অনুরোধ

করেন। সুলতান সে অনুযায়ী মাওলানা হামীদ দানিশমন্দকে বিয়াল্লিশ মৌজার লাখারাজ বা নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন।[৩৮]

গৌড়ের কোন্ শাসক এই মহৎ কাজ করেছিলেন তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। তবে কোন কোন বিবরণে এটি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাঘার দানিশমন্দ পরিবার যে মদদ-ই-মা'শ হিসেবে মুসলমান শাসকের নিকট থেকে লাখারাজ ভূমি পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। বাঘার মসজিদের শিলালিপির সাক্ষ্যে বলা যায় যে, নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ ৯৩০ হিজরী/১৫২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন।[৩৯] শাহ দাওলা তখন স্থায়ীভাবে বাঘায় বসবাস শুরু করেছেন। তিনি জঙ্গলাকীর্ণ বাঘায় জনপদ গড়ে তোলেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে শিরক ও অনাচারের মূলোৎপাটন করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

হযরত মাওলানা শাহ দাওলার পুত্র হযরত মাওলানা হামীদ দানিশমন্দ পিতার ন্যায় হক্কানী আলিম ও কামিল সূফী ছিলেন। ইসলামী শিক্ষার প্রসারের জন্যে তিনি সর্বোৎকৃষ্টভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মাওলানা আবদুল হামীদ দানিশমন্দের পুত্র হযরত আবদুল ওয়াহাব একজন কামিল সাধক ছিলেন। তাঁর পুত্র মাওলানা রফিকের বংশধরগণ রইস-ই-বাঘা হিসেবে মর্যাদা পেয়ে এসেছেন।

হযরত শাহ মুকাররাম

রাজশাহী শহর হতে পশ্চিম দিকে প্রায় বার মাইল দূরত্বে রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাস্তার পাশে কুমারপুরে হযরত শাহ মুকাররামের মাকবারা অবস্থিত।[৪০] এখন মাকবারা ইমারতটি প্রায় ধ্বংসোন্মুখ।

হযরত শাহ মুকাররাম একজন কামিল ওলী ছিলেন। তিনি রাজশাহীর কুমারপুর অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও দীনের প্রসারের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর প্রচারকাল ছিল সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। তিনি বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিংবা অন্য কোন দেশ থেকে এসেছিলেন তা সঠিক করে বলা যায় না। ষষ্ঠদশ শতকে বাংলাদেশ বিশেষ করে রাজশাহীতে বৈষ্ণব মতবাদ যথেষ্ট প্রভাব

বিস্তার করে এবং এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈসলামিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এই বৈষ্ণব মতবাদ যাতে মুসলমানদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করতে না পারে সে জন্যে হযরত শাহ মুকাররাম শ্রীচৈতন্য দেবের প্রধান শিষ্য খেতুরের নরোত্তম ঠাকুরের সাথে পরোক্ষভাবে ধর্মীয় আদর্শের তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাঁর নিকট অনেক আলিম ও সূফী জমায়েত হন এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিরক, কুফর ও বৈষ্ণব মতবাদ প্রতিহত হয়। আনুমানিক ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি কুমারপুরে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানে সমাহিত হন।[৪১] কোন কোন বর্ণনার সূত্রে তিনি এবং শাহ মখদুমের সমাধি-সৌধের শিলালিপির মির্জা আলী কুলী বেগকে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪২] কিন্তু প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট মত পেশ করা সম্ভব হলো না।

হযরত শাহ নিয়ামাতুল্লাহ

গৌড়ের শহরতলী এবং বৃহত্তর রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার (বর্তমানে উপজেলা) ফিরোজপুর মৌজায় ছোট সোনা মসজিদের অর্ধ মাইল উত্তর-পশ্চিমে শাহ নিয়ামাতুল্লাহর সমাধি-সৌধ অবস্থিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধি-সৌধটি অতি মনোরম।

শাহ নিয়ামাতুল্লাহ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় তাঁকে সেনাধ্যক্ষ বা শাসনকর্তা (ওয়ালী) এবং অন্য বর্ণনায় তাঁকে ওলী ও সাধক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সম্ভবত প্রথম জীবনে তিনি প্রশাসনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং জ্ঞানী ও সৎ ব্যক্তি হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ক্রমান্বয়ে ইল্‌ম ও আমলে তিনি এত উৎকর্ষ সাধন করেন যে, পরবর্তীতে তিনি ওলী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর সমাধি-সৌধের ব্যয় নির্বাহের জন্যে বার্ষিক দেড় হাজার টাকা আয়ের একটি ভূমি দান করা হয়েছে।

দিল্লীর কারনালের অধিবাসী ছিলেন শাহ নিয়ামাতুল্লাহ। তবে কোন কোন বর্ণনার সূত্রে জানা যায় যে, তিনি কাশ্মীরের নরওয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর আতাউল্লাহ। তিনি একজন পরিব্রাজক ছিলেন এবং এই ভ্রমণের সূত্রে তিনি রাজমহলে আসেন। সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ

সুজা ছিলেন তখন বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা । শাহ সুজা তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করেন এবং ইকতা হিসেবে লাখারাজ ভূমি প্রদান করেন। শাহ সুজা প্রশাসনিক ব্যাপারেও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। শাহ নিয়ামাতুল্লাহ গৌড়ের শহরতলী ফিরুযপুরে স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ১০৭৫ হিজরী/১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে এবং অপর একটি সূত্র অনুযায়ী ১০৮০ হিজরী ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।[৪৩] তবে তাঁর সম্পর্কে লিখিত একটি ফারসী পংক্তির আবজাদ পদ্ধতিতে আক্ষরিক মূল্যমান নিরূপণ করে ১০৭৫ হিজরী/১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ তাঁর মৃত্যুর সাল হিসেবে গণ্য করা যায়।[৪৪]

শাহ নিয়ামাতুল্লাহ বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা শাহ সুজার আধ্যাত্মিক মুরশিদ ছিলেন বলে উল্লেখ আছে।[৪৫] তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শাহ সুজাকে পরামর্শ দান করতেন । একটি উপাখ্যানের সূত্রে জানা যায় যে, মুঘল বাদশাহ আলমগীর আওরঙ্গজেব, শাহ নিয়ামাতুল্লাহর প্রতি সন্দেহপরবশ হয়ে তাঁর একজন কর্মচারী দিলির খানকে তাঁর শিরোচ্ছেদ করার জন্যে প্রেরণ করেন। কারণ তিনি শাহ সুজাকে বাদশাহ আলমগীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এটি ছিল নিছক সন্দেহ মাত্র। কিন্তু দিলির খান যখন তাঁর দুই পুত্রকে নিয়ে গৌড়ে উপস্থিত হন তখন ফতহ খান নামক এক পুত্র রক্তবমি করে অকুস্থলে মারা যায়। এতে দিলির খান শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ওলীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বাদশাহকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। বাদশাহ তখন শাহ নিয়ামাতুল্লাহর নিষ্ঠা ও সাধুতার উপর বিশ্বাস করেন এবং তাঁর উপর অযথা সন্দেহ করা থেকে বিরত হন।[৪৬]

শাহ নিয়ামাতুল্লাহ শামসউদ্দীন আবুল ফতহের অধীনে কাদরিয়া শাইখ মুহাম্মদের অধীনে চিশতীয়া এবং মুহাম্মদ বিন জালাল গুজরাটীর অধীনে নক্শবন্দী সূফী তরীকার সবক গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় কামালিয়াত হাসিল করেন।[৪৭] তিনি জনগণকে ইসলামী তালিম দান করেন এবং সব রকমের শিরক ও বেদাআত থেকে তাদের বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালান।

কাসীদা-ই-নিয়ামাতুল্লাহ বা নিয়ামাতুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী এই নিয়ামাতুল্লাহর বাণী হিসেবে কোন কোন লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয় এবং তার

প্রামাণ্য কোন তথ্য আমাদের জানা নেই । যে নিয়ামাতুল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী সূচক কাসীদা রচনা করেছিলেন তিনি ছিলেন একজন কামিল ওলী এবং ইরানের অধিবাসী। তিনি কখনও ভারত উপমহাদেশে আসেননি।

হযরত মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবী

এই আলিম ও সাধক খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় বৃহত্তর রাজশাহী জেলার মাহিসুন বা মাহিসন্তষে এসে ইল্মে দীন প্রচার করেন। বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামুরহাট থানায় মাহিসন্তষ অবস্থিত। শাইখ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরীর পিতা ইয়াহিয়া মানেরী মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।[৪৮] এই হক্কানী আলিম ও আধ্যাত্মিক সাধক আরবদেশ থেকে এসেছিলেন বলে তাঁর নামের সাথে আল-আরাবী যুক্ত করা হয়েছে। সম্ভবত মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবী সুহরাওয়ার্দীয়া সূফী তরীকার অনুসারী ছিলেন, এবং এই বিশেষ তরীকার বহু সূফী ও ওলী মাহিসন্তষে সমাহিত আছেন।[৪৯] মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবীর মাযার মাহিসন্তষে আছে। এসব আলিম ও সূফী-সাধকের প্রচেষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়।

শাইখ কবুল ও শাইখ হাজী

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার আমরুল পরগণার অন্তর্গত সাহাগোলা গ্রামে গোল মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি পশ্চিম দেশ থেকে এসে বসবাস শুরু করেন।[৫০] সম্ভবত মুঘল সম্রাট শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ শাহজাহানের শাসনামলের (হিজরী ১০৩৭-১০৬৮/১৬২৮-১৬৫৮খৃঃ) প্রথম দিকে গোল মুহাম্মদ জীবিকার সন্ধানে ইরানের পূর্বাঞ্চল থেকে প্রথমে দিল্লীতে আসেন এবং সেখান থেকে পরে সুবা বাংলার রাজশাহী জেলার সাহাগোলা গ্রামে বাস করতে থাকেন। এই ব্যক্তি আরবী, ফারসী ও ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে একজন পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সম্রাট শাহজাহান ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ইকতা হিসেবে তাঁকে লাখারাজ ভূমি প্রদান করেন। তাঁর পাঁচ পুত্র শাইখ কবুল, শাইখ হাজী, শাইখ পিয়ার, শাইখ ফাযিল ও শাইখ তাজ।[৫১]

পঞ্চম পুত্র শাইখ তাজ বাংলার বাইরে চলে যান। বাকী চার পুত্র সাহাগোলাতে থেকে যান। পরে শাইখ কবুল ও শাইখ হাজী ভ্রাতৃদ্বয় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সাহাগোলার পূর্বদিকে আসেন এবং তদানীন্তন রাজশাহী জেলার নন্দিগ্রাম থানার (বর্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত) তারাটিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। শাইখ কবুল ও শাইখ হাজী উভয়েই আরবী, ফারসী ও ইসলামী জ্ঞানে বিশিষ্ট আলিম এবং সূফী-সাধক ছিলেন। তাঁরা খাজা মুইনুদ্দীন (রা)-এর চিশতীয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। তাঁরা ইল্‌মে মারিফাত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। জনশ্রুতিতে তাঁদের কারামত বা অলৌকিক কাজের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। শাইখ কবুল ও শাইখ হাজী তারাটিয়া গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের শিলালিপির সূত্রে জানা যায় যে, হিজরী ১০৬৭ এর জেলহাজ্জ মাসে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং হিজরী ১০৬৮ এর মুহাররম মাসের তের তারিখে তা শেষ হয়। লিপির উৎকীর্ণ শিল্পীর নাম ফকির রওশন হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। সম্রাট শাহজাহানের নিকট হতে শাইখ কবুল ও শাইখ হাজী তারাটিয়া, উলুবাড়িয়া ও বিজয়কান্দী মৌজার ভূসম্পত্তি লাভ করেন এবং তাঁরা তারাটিয়ার পীর-জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৫২] ক্রমান্বয়ে এঁদের জমি বংশধরের মধ্যে খন্ডিত হয়ে যায় এবং আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এতদসত্ত্বেও তাঁরা এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইল্‌মে দীনের প্রসার ও তাওহীদী দাওয়াতকে সমুন্নত রেখেছিলেন। স্মর্তব্য যে, শাইখ কবুলের বংশধর তারাটিয়ায় থেকে যান। কিন্তু শাইখ হাজীর পর তাঁর বংশধর শাইখ আমীর বর্তমান বগুড়া জেলার নন্দিগ্রাম উপজেলাধীন হাটধুমা গ্রামে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। লেখক এই শাইখ হাজীর অধস্তন পুরুষের মধ্যে পরিগণিত। হাটধুমার শাইখ পরিবার সম্পদের দিক হতে যথেষ্ট উন্নতি না করতে পারলেও দীনী ইল্‌ম ও আধুনিক শিক্ষায় তাঁরা এ অঞ্চলের মধ্যে উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছেন। সততা ও আল্লাহ্‌ভীরুতা এই পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বৃটিশ যুগে এ অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা অনুপ্রবেশ করে। এমনকি হিন্দুদের পূজা পার্বণে মুসলমানেরা যোগদান করে। দীনী ইল্‌ম ও ইসলামী অভিজ্ঞান সম্পন্ন লোকের যথেষ্ট অভাব ঘটে। এমনি সময়-

সন্ধিক্ষণে শাইখ হাজীর বংশধরের মরহুম শাইখ শামীর এবং তাঁর পুত্র মরহুম শাইখ আলহাজ্জ বাসতুল্লাহ ইল্‌মে দীনের দিকে জনগণকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। শিরক, বেদআত ও ইসলাম বিগর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখতে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, মরহুম শাইখ আলহাজ্জ বাসতুল্লাহর (মৃঃ ১৯৮৭ খৃঃ) পুত্রগণ[৫৩] পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রাখার উদ্দেশ্যে এবং স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণার্থে সাম্প্রতিককালে মুজাদ্দিদ আলফে সানি নাম দিয়ে স্বগ্রাম হাটধুমায় একটি দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং তা সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে। এ অঞ্চলে দীনী ইল্‌মের প্রসারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এ মাদ্রাসা অনন্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী।

রাজশাহী জেলার চারিদিকে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে উলামা, মাশায়েখ, সূফী-সাধক ও ওয়াইযগণ জনসাধারণের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন। উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হতে এ অঞ্চলের জনগণ ব্যবসার সূত্রে আগত মুসলিম বণিক ও ইসলাম প্রচারকগণের সংস্পর্শে আসার-সুযোগ পান। তাঁরা ইসলামের সার্বজনীনতা, উদারতা, সাম্য ও জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামকে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক পরিত্রাণের একমাত্র মুক্তি সনদ হিসেবে বিশ্বাস করেন। এভাবে ইসলাম প্রচারের যে ধারা শুরু হয়েছিল তার ফলে মুসলিম বিজয়ের পর মুসলিম শাসকদের পক্ষে শাসন কাঠামোকে শরীয়তভিত্তিক-করণ এবং ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই ইসলাম প্রচারের ধারার দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা মাসাজিদ ও মাদারিসের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব। মুসলিম শাসনামলে রাজশাহী জেলায় প্রতিষ্ঠিত মাসাজিদ ও মাদারিসের সংখ্যা আশাব্যঞ্জক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচারে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকার ভূমিকা

ইসলাম প্রচারে এবং মুসলিম সমাজ গঠনে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মদীনায় হিজরত করার পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ

(সা)–এর প্রথম কাজ ছিল মসজিদ নির্মাণ। এই মসজিদে নামায আদায় করা ব্যতিরেকে শিক্ষা থেকে শুরু করে একটি মুসলিম সমাজ গঠনের জন্যে যা প্রয়োজন তা মহানবী (সা) আনজাম দিয়েছেন। বিশেষ করে দরস তাদরীসের কাজ মসজিদে সবসময় অব্যাহত ছিল। মহানবী (সা)–এর মদীনার মসজিদে নামায আদায়, ইল্‌মের চর্চা এবং গভীরভাবে ইবাদত ও প্রশিক্ষণের জন্যে সুফ্‌ফার (পরবর্তীকালের খানকার প্রাথমিক রূপ) ব্যবস্থা মসজিদের ব্যাপক কার্যক্রমের একটি অবকাঠামো সর্বযুগের জন্যে নিরূপণ করে দিয়েছে। তাই বিজয়ী বেশে মুসলমানরা যে দেশ ও অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন সেখানেই তাঁরা মহানবী (সা)–এর অনুকরণে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। বাংলা এর ব্যতিক্রম নয়। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলা জয় করে রাজধানী শহর লাখনাবতী এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা নির্মাণ করেন।[৫৪] মুসলিম শাসনামলে বাংলায় এ ধারা অব্যাহত ছিল। রাজশাহী জেলায় মুসলিম শাসনামলে যেসব মসজিদ নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে দরসবারী মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, বাঘা মসজিদ ও কুসুম্বা মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব মসজিদ এখনও অতীত গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে এসব স্থাপত্য কীর্তির উপর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে। এ ছাড়াও শিলালিপি ও প্রামাণ্য সূত্রে রাজশাহীর বিভিন্ন স্থান ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মিত মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলের এসব মসজিদ প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা সনাক্ত করা যায় এমন সামান্য স্থাপত্য চিহ্ন নিয়ে কালের স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে । রাজশাহী জেলার এসব মসজিদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়ে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রদান ও প্রসারের জন্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল।

রাজশাহী জেলায় মুসলিম শাসনামলের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলো ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এসব মাদ্রাসা আজ আর টিকে নেই। এসব আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে শিলালিপির সূত্রে অথবা সমকালীন রচিত গ্রন্থ হতে রাজশাহী জেলার কিছু কিছু মাদ্রাসার সন্ধান আমরা পাই। শিলালিপির সূত্রে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত যে মাদ্রাসার সন্ধান মিলেছে তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

দরসবারী মসজিদ ও মাদ্রাসা

গৌড়ের শহরতলী এবং বৃহত্তর রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন ঘোষপুরের দরসবারী মসজিদের ধ্বংসস্তূপ হতে সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের শাসনামলের (১৪৭৪–১৪৮১ খৃঃ) একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে । এই শিলালিপিতে সুলতান কর্তৃক ৮৮৪ হিজরী/১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখিত হয়েছে।[৫৫] দরসবারী মসজিদের পরিকল্পনা এর জামে মসজিদ হওয়া নির্দেশ করে। দরসবারী নাম থেকে এটি অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, এই মসজিদে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল। মসজিদে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা থাকে তার চেয়ে এই মসজিদে উন্নত ও উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এই মসজিদ হতে পূর্ব দিকে দু'তিন শত গজ দূরে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ইমারতের ভিত্তিস্তর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উন্মোচিত হয়েছে। এর ভূমি পরিকল্পনা একটি মাদ্রাসা–ইমারতের পরিকল্পনা হিসেবে পন্ডিতগণ সনাক্ত করেছেন। ১৯৭৩ সালে এর ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি শিলালিপি সংগৃহীত হয়েছে এবং তাতে সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ কর্তৃক ৯০৯ হিজরী /১৫০৩ খৃষ্টাব্দে একটি মনোরম ও পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসা নির্মাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৬] এই দরসবারী থেকে সংগৃহীত দুটি শিলালিপির সূত্রে বলা যায় যে, সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্বলিত একটি জামে মসজিদ এবং তার পাশে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসা নির্মাণের কাজ শুরু করেন। জামে মসজিদটির নির্মাণ কাজ ৮৮৪ হিজরী/১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। কিন্তু মাদ্রাসা নির্মাণের কাজ তার আমলে শেষ হয়নি, এবং সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ কর্তৃক তা ৯০৯ হিজরী/১৫০৩–৪ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়।[৫৭] এই মাদ্রাসাটি বাংলার সুলতানী আমলে রাজশাহীর পশ্চিমাঞ্চলের বিরাট অংশ জুড়ে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিল। শিক্ষার্থিগণ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে এসে তাঁদের জ্ঞানের পিপাসা প্রশমিত করে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বাঘার মাদ্রাসা

হুসাইন শাহী আমলের একটি মসজিদ এখনও বাঘায় বিদ্যমান। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এর সংস্কার করে নামাযের জন্যে এটিকে উপযোগী করে তুলেছে। এই মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথের উপরি অংশে একটি শিলালিপি দেয়ালগাত্রে সংযুক্ত আছে। এই

শিলালিপির সূত্রে জানা যায় যে, সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ (শাসনকাল ১৫১৯–১৫৩১ খৃঃ) কর্তৃক ৯৩০ হিজরী/ ১৫২৩–২৪ খৃঃ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।৫৮ আবদুল লতীফের ভ্রমণ বিবরণী হতে জানা যায় যে, খড়ের ছাউনির একটি মাটি নির্মিত গৃহে হাওদা মিয়া একটি মাদ্রাসা পরিচলনা করতেন। হযরত মাওলানা হামীদ দানিশমন্দ নামের অপভ্রংশ সম্ভবত হাওদা মিয়া। ১৬০৯ সালে বাঘা পরিভ্রমণের সময় আবদুল লতীফ হাওদা মিয়াকে একশত বছরের এক বৃদ্ধ হিসেবে দেখেছিলেন।৫৯ কাজেই তাঁকে বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহের সমসাময়িক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতে কোন বাধা নেই। উপরে উল্লেখিত শিলালিপি এবং আবদুল লতীফের বিবরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলা যায় যে, সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ কর্তৃক ১৫২৩–২৪ খৃষ্টাব্দে বাঘায় মসজিদ নির্মাণকালে হামীদ দানিশমন্দের বয়স পনের বছরের মতো হবে। হামীদ দানিশমন্দের পিতা শাহ মুয়াযযাম দানিশমন্দ (যিনি শাহ দাওলা নামে সমধিক পরিচিত) এই বাঘায় এসে সূফী প্রশিক্ষণের জন্যে একটি খানকা এবং ইল্‌মে দীনের প্রসারের জন্যে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন।৬০ ক্রমান্বয়ে এই স্থানটি মনুষ্য বসতিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তা কসবা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ কসবা হিসেবে এর প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন এবং এখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। উপরন্তু এই সময় তিনি শাহ মুয়াযযাম দানিশমন্দ বা শাহ দাওলা কর্তৃক স্থাপিত মাদ্রাসায় ইকতা হিসেবে লাখারাজ ভূমি দান করেন।

বাঘার এই প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায় কুরআন, হাদীস ও ফিকহ্ সহ ইসলামী অভিজ্ঞানের সকল বিষয়ের উপর পাঠদান করা হতো। এখানে ইল্‌মে তাজবীদ ও কুরআন মজিদ হিফ'জ করারও ব্যবস্থা ছিল। কেবলমাত্র বাংলা নয়। বরং বাংলার বাইরের শিক্ষার্থিগণ বাঘার মাদ্রাসায় ইল্‌মে দীনের.পাঠ সমাপ্ত করে উচ্চতর শিক্ষার সনদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রচারে ব্রতী হতেন এবং ইল্‌মের চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগের জরিপে এই বাঘার মাদ্রাসার উল্লেখ আছে। এই মাদ্রাসা তাই এই অঞ্চলে বহুকাল ধরে ইসলামের প্রচার ও ইল্‌ম বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছিল।১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে মাদ্রাসাটি ধসে

পড়ে। প্রখ্যাত আলিম ও ইসলামী অভিজ্ঞানে খ্যাতিসম্পন্ন [illegible] মাওলানা [illegible] আলী এই মাদ্রাসায় প্রধান মুদাররিস হিসেবে দায়িত্ব [illegible]।

ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা মাদ্রাসা জনগণের মধ্যে ইল্‌মের প্রসারের জন্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। পরে এসব মাদ্রাসায় মুসলমান শাসক লাখারাজ ভূমি দান করে সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করেছেন। শিলালিপির সূত্রে এসব মাদ্রাসা সম্পর্কে কোন তথ্য [illegible] হওয়া না গেলেও তৎকালীন রচিত গ্রন্থ থেকে এগুলোর অবস্থান, [illegible] ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। [illegible] রাজশাহী [illegible] যে মাদ্রাসার সন্ধান মেলে তার নাম হলো মাহিসন্তষ মাদ্রাসা। [illegible] তার বিবরণ দেয়া হলো ঃ

মাহিসন্তষ মাদ্রাসা

বর্ণিত আছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাওলানা তাকীউদ্দীন আল–আরাবী মাহিসুনে (বৃহত্তর রাজশাহী জেলার মাহিসন্তষ বলে [illegible]) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।৬১ বিশিষ্ট [illegible] ও প্রখ্যাত সূফী শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মনেরীর পিতা ইয়াহিয়া মনেরী মাওলানা তাকীউদ্দীন আল–আরবীর নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন।৬২ ইল্‌মে দীনের বিভিন্ন শাখায় এবং মারিফাত তত্ত্বে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। উভয় বিষয়ে মাওলানা তাকীউদ্দীন আল–আরবী তাঁর উস্তাদ ও মুরশিদ ছিলেন।একটি বর্ণনার সূত্রে জানা যায় যে, ইয়াহিয়া মানেরী ১২৯১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন । তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মাহিসন্তষের মাদ্রাসায় মাওলানা তাকীউদ্দীন আল–আরবীর নিকট ইয়াহিয়া মানেরী শিক্ষালাভ করেন। ক্রমান্বয়ে বাংলার সুলতানী আমলে এই স্থানটি প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলে (১৪৫৯–১৪৭৪ খৃঃ) এটি টাঁকশাল শহরের রূপ লাভ করে। বারবক শাহের নামানুসরে এটি বারবাকাবাদ নামে অভিহিত হয়।৬৩ বর্তমানে একটি বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে এই টাঁকশাল শহরের প্রাচীন চিহ্নসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একটি জামে মসজিদের ধ্বংসচিহ্ন

দুর্গপ্রাকার ও পুরাতন সমাধিগুলো নির্দেশ করে যে, মধ্য যুগের বাংলার ইতিহাসে এই স্থানটির প্রভূত গুরুত্ব ছিল। কাজেই যুক্তি সঙ্গত কারণে বলা যায় যে, মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসা পরবর্তীকালে বাংলার মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গণ্য হয়। মাদ্রাসাটির খ্যাতি চারিদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এই উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে শিক্ষালাভ করতেন। এসব শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিম ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় ইসলাম প্রচরের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং জনগণ ইসলামের সার্বিক বিধানের সাথে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল। এসব মাদ্রাসা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কিভাবে অবদান রেখেছিল তা জানতে হলে পঠিতব্য বিষয় ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে আমাদের ওয়াকেফহাল হতে হবে।

মাদ্রাসায় অনুসৃত পাঠ্যসূচী

বিভিন্ন উৎসের পর্যালোচনা করে উপরে উল্লেখিত মাদ্রাসাসমূহে পঠিতব্য বিষয় ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে একটি আলোচনা উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি। মুসলমান শিশুরা মক্তব ও মসজিদে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে । প্রত্যেক মসজিদ সংলগ্ন স্থানে সাধারণত মক্তব পরিচালিত হয়ে থাকে। আবার কখনও এইসব মক্তব অবস্থা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহে তাঁদের অর্থে পরিচালিত হয়। শরীয়তের অনুশাসনে সাত বছর থেকে একজন মুসলমান বালক ও বালিকার উপর নামায এবং ইসলামের অন্যান্য রুকন পালন ফরয হয়। ইসলামের এই সব কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে একজন শিশুর অন্তত দু'বছর সময় প্রয়োজন। কাজেই এটি ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, একটি শিশুকে পাঁচ বছর বয়সের সময় মক্তব কিংবা মসজিদে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করতে হয়, যাতে করে সে দু'বছর সময়ের মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও প্রারম্ভিক দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। মুসলিম সমাজে চার বছর, চার মাস ও চার দিনে একজন বালক অথবা বালিকার বিসমিল্লাহ অনুষ্ঠান করে শিক্ষা আরম্ভ করার রীতি আছে। মোটকথা চার ও পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে একজন শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে মক্তব অথবা

মসজিদে হাজির হতে হবে। বিশেষ কারণে এই সময়সীমা পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে।

মুসলিম শিশুদের জন্যে মক্তব ও মসজিদে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে। মসজিদের ইমাম শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের মৌলিক অনুশাসন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন। মুসলিম শাসনামলে সমকালীন সাহিত্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখিত হয়েছে যে, মৌলবীগণ মক্তবে মুসলমান ছাত্রদিগকে অযু ও নামায সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন।৬৪ ইসলামের মৌলিক অনুশাসন এবং অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে অবগত হতে হলে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান হাসিল করা অপরিহার্য। সমসাময়িক সাহিত্যের সূত্রে জানা যায় যে, সাইয়েদ, কাযী এবং সমাজপতিগণ কুরআন ও হাদীসের অনুশাসন অনুযায়ী মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দান করতেন।৬৫ কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলার অন্যান্য মাদ্রাসার ন্যায় রাজশাহী জেলার এইসব মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে কুরআন ও হাদীসের পঠন-পাঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইসলামে অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে হলে ফিকহ্ শাস্ত্রের অভিজ্ঞান পূর্ব শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে ফিক্হ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসকে মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করে মুজতাহিদ বা আইন বিশেষজ্ঞরা যাবতীয় সমস্যার সমাধান দান করে যে ব্যবহারিক শাস্ত্রের সূত্রপাত করেছেন তাকে ফিক্হ হিসেবে অভিহিত করা হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে কুরআন ও হাদীসে এমন গভীর অভিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না যা দিয়ে প্রতিটি সমস্যার শরীয়ত সম্মত সমাধান করে অনুশাসন পালন করতে পারে। এই জন্যে ফিক্হ বা ব্যবহারিক শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। তাহলে বলা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ বা ব্যবহারিক শাস্ত্রের পঠন-পাঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল। মসজিদ ও মক্তবে এই সব বিষয়ের উপর পাঠদান করা হতো।

এই তিনটি বিষয়ের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভাষা হিসেবে আরবী, ফারসী ও বাংলা শিখানো হতো। কুরআনের ভাষা হিসেবে ছাত্রদের জন্যে

আরবী ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক বলে গণ্য হতো। বাংলার সুলতানী আমলে উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি এই মতকে সমর্থন করে। রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে অনুরূপভাবে ফারসী ভাষার শিক্ষাদান করা হতো। উপরন্তু ফারসী ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থাদি রচিত হতো। কাজেই এসব গ্রন্থের অধ্যয়নের জন্যে ফারসী ভাষা শিখতে হতো। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে সুলতানদের দরবারে আগত চৈনিক রাজদূতদের বর্ণনায় জানা যায় যে, শাসক, অমাত্য ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ফারসী ও বাংলা ভাষায় সমভাবে পারদর্শী ছিলেন।[৬৬] এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে,শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে এবং আরবী,ফারসী ও বাংলা ভাষা হিসেবে ছাত্রদের পাঠ্যসূচী ভুক্ত ছিল।

এই প্রাথমিক শিক্ষার পর আসে ছাত্রদের জন্যে প্রাগ্রসর শিক্ষা। উন্নতমানের মাদ্রাসায় প্রাগ্রসর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। রাজশাহী জেলাধীন যে তিনটি মাদ্রাসা শিলালিপি ও সমসাময়িক রচিত গ্রন্থের সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে তাতে শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রাগ্রসর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার মূল বিষয় আরো ব্যাপক ও বিশ্লেষণধর্মী করে প্রাগ্রসর ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করা হতো। কাজেই কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা প্রাগ্রসর শিক্ষার পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের তাশরীহ এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় ও সমস্যার উপর কুরআন ও হাদীস থেকে সিদ্ধান্ত ও যুক্তি দিয়ে পেশ করতে ইজতিহাদ এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। মহানবী (সা) মুয়ায বিন জাবালকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের সময় কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশ মিলে না এমন বিষয়ের উপর কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইজতিহাদের মাধ্যমে মত পেশ করার অভিপ্রায়কে প্রশংসা করেছিলেন।[৬৭] এই ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে সুন্নি মুসলমানদের চারটি অনুমোদিত মযহাব (আইন বিন্যাসের পদ্ধতি ও পথ) গড়ে উঠেছে। কাজেই প্রাগ্রসর শিক্ষার প্রধান বিষয় হিসেবে মাদ্রাসায় ফিক্হ শাস্ত্রের পঠন–পাঠন ও অনুশীলনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এইসব বিষয় ছাড়াও তর্কবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, আল–কেমী বা রসায়ন, হিনদাসা বা জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, তারীখ বা ইতিহাস এবং আরো

অনুরূপ বিষয় প্রাগ্রসর শিক্ষার পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীর মাদ্রাসায় এইসব বিষয়ের উপর পাঠদানের ব্যবস্থা থাকত। উপরে বর্ণিত রাজশাহীর মাদ্রাসাগুলো (দরসবারী, বাঘা ও মাহিসন্তুষ মাদ্রাসা) প্রথম শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় এসব বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল। এ সম্পর্কে সম্রাট [illegible] দরবারী [illegible] মজলের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "প্রত্যেক [illegible], গণিত, কৃষি, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পরিমাপ– কৌশল, [illegible], চিকিৎসা, যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে [illegible] হতো।"[৬৮] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর [illegible] শিক্ষায়তনে এইসব বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা থাকত। তবে [illegible] শিক্ষার্থী সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করা বা পারদর্শিতা অর্জনের জন্যে বাধ্য ছিল না। নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে প্রাগ্রসর শিক্ষার্থিগণ এক বা একাধিক বিষয়ে অধ্যয়ন করে দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ লাভ করত।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাখা শবব্যবচ্ছেদ ও শরীর–কাঠামো বিদ্যা প্রথম শ্রেণীর মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। একটি শিলালিপিতে সুলতান জালাল উদ্দীন ফত্‌হ শাহকে (শাসনকাল ১৪৮১–১৪৮৬ খৃঃ) কুরআনের রহস্যের ভেদ উন্মোচনকারী এবং ধর্ম ও শরীর তত্ত্বের অভিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৬৯] সুলতান সম্পর্কে এই গুণাবলীর প্রয়োগ নির্দেশ করে যে, বাংলার উচ্চতর শিক্ষায়তনে বা প্রথম শ্রেণীর মাদ্রাসাসমূহে তাফসীর, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং শরীর –বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। তীর চালনা ও যুদ্ধ কৌশল উচ্চতর শিক্ষায়তনের পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল । তবে এটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রাগ্রসর শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতো । মুহাম্মদ বুদাই কর্তৃক লিখিত হিদায়াত আর–রামী [৭০] বা তীর চালনার নির্দেশিকা প্রমাণ করে যে, তীর চালনা বিদ্যা এ দেশের মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য স্থাপত্য ইমারতের শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির [৭১] সাক্ষ্য বলা যায় যে, ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলা একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র–মাদ্রাসাসমূহের পঠিতব্য বিষয়ের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আরবী ও ফারসী ভাষার উপর পূর্ণ দখল অর্জন করতে না পারলে ঐসব বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সে কারণে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। সুলতানী বাংলায় আরবী ও ফারসী ভাষায় উৎকর্ষ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

উচ্চতর শিক্ষার মাদ্রাসাসমূহ বাংলার মুসলিম শাসকদের আর্থিক অনুদান এবং প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতো। শিলাগাত্রের বিভিন্ন উৎকীর্ণ লিপির সূত্রে বলা যায় যে, শাসকগণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্যে আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করে উচ্চতর শিক্ষার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছেন।[৭২] আলোচ্য জেলা–রাজশাহীর উপরে উল্লেখিত মাদ্রাসাসমূহ উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে মুসলিম শাসকদের অনুদান লাভ করেছে। কুসুম্বা বাঘার মাদ্রাসা তার পরিচালনার জন্যে মদদ–ই–মাশ হিসেবে মুসলিম প্রশাসন থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির ইকতা লাভ করেছে।[৭৩] স্থানীয় উপাখ্যানের সূত্রে জানা যায় যে, মাহিসন্তষের মসজিদ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ২৭৫০ বিঘা লাখারাজ ভূমি অনুদান হিসেবে মুসলিম শাসন আমল থেকে চলে আসছিল, এমনকি তা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল।[৭৪] বৃটিশ শাসনামলে ক্রমান্বয়ে তা রদ হয়ে যায়। এসব উদাহরণ থেকে বলা যায় যে, মুসলিম শাসনামলে উচ্চতর শিক্ষার মাদ্রাসাসমূহ পূর্ণ সরকারী অনুদানে পরিচালিত হয়েছে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থির যাবতীয় খরচ মুসলিম প্রশাসন বহন করেছে।

রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচারের কার্যক্রমে মাদ্রাসা অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের শিক্ষালাভ করে শিক্ষার্থিগণ তাদের জীবনে সেগুলো বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেয়েছেন এবং সাধারণ জনগনকে সে সবের শিক্ষাদান করেছেন। এমনিভাবে পরিবার ছাড়াও সমাজের বৃহত্তর পরিসরে ইসলামের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্তু এসব মাদ্রাসায় তালীম পেয়ে যেসব আলিম বের হয়েছেন তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের

কার্যক্রম চালু রেখেছেন। বিগত দিনগুলোতে মুসলিম সমাজে যেসব অনৈসলামিক আচার–অনুষ্ঠান জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবেশ করেছিল সেগুলোর বিরুদ্ধে আলিমগণ সোচ্চার হয়েছেন এবং দূরীকরণের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এইভাবে মাদ্রাসা প্রকৃত আলিম তৈরির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার, ইসলামী জীবনবোধ জাগ্রত করা এবং সমাজ সংস্কারের কার্যক্রম অনুকূল অথবা প্রতিকূল অবস্থাতেও অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমান সময়েও শত বাধা–বিপত্তির মুখে মাদ্রাসা তার ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে এবং আলিমগণ অশুভ শক্তির গতিরোধ করে মুসলিম সমাজকে ইসলামী জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। তবে দুনিয়ালোভী আলিমগণ ব্যতিক্রমধর্মী কার্যকলাপের জন্যে নিন্দা ও ধিক্কার লাভ করে আসছে। এসব ব্যক্তি 'উলামা সূ' এর পর্যায়ভুক্ত এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট তাঁরা মর্যাদাশীল নন।

মুসলিম বিজয় ও রাজশাহী জেলায় প্রশাসনিক ইউনিট বা বিভাজন

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে খলজী–তুর্কীরা ১২০৪ খৃষ্টাব্দে সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে লাখনাবতী রাজ্য জয় করেন।[৭৫] তাবাকাত–ই–নাসিরীতে লক্ষণ সেনের রাজধানী নু–দিয়া বলে উল্লেখ আছে।[৭৬] এই স্থান থেকে লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। আধুনিক পন্ডিতগণ নু–দিয়াকে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া বলে সনাক্ত করেছেন এবং এই মত স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে বিভিন্ন সূত্র ও পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে কোন কোন পন্ডিত নু–দিয়াকে রাজশাহী জেলার রহনপুরের নওদা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।[৭৮] বাংলার প্রবেশ পথ তেলিয়াগড়হী হতে প্রবেশ করলে লাখনাবতীর নিকটবর্তী স্থান হচ্ছে নওদা। এখানে লক্ষণ সেন বখতিয়ার খলজীর আগমন সংবাদ পেয়ে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানে একটি বুরুজ এবং অস্থায়ী রাজধানীর জন্যে প্রয়োজনীয় ইমারত ছিল বলে অনুমান করা যায়। এটি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। আজও নওদা বুরুজ প্রাচীনতার স্বাক্ষর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাবাকাত–ই–নাসিরীর নু–দিয়াকে নওদা হিসেবে সনাক্ত করা হলে বলা যাবে

যে, বখতিয়ার খলজী বাংলায় আগমন করেই রাজশাহীর নওদা জয় করেছিলেন। এবং এখান থেকে সমগ্র বারিনদ বা বরেন্দ্র অঞ্চলের উপর তাঁর জয় সম্প্রসারিত করেছিলেন। এর পর তিনি লাখনাবতী ও দেওকোটে তাঁর বিজিত অঞ্চলের জন্যে দারুলমুলক বা রাজধানী শহর স্থাপন করেছিলেন।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী তাঁর বিজিত অঞ্চলকে কতকগুলো ইকতা বা প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেছিলেন। এসব ইকতার মধ্যে মাসিদা-সন্তুষ ও নারকুটী উল্লেখযোগ্য। তাবাকাত-ই-নসিরীতে এ সবের উল্লেখ আছে। মাসিদা-সন্তুষ এবং নারকুটীর সনাক্তকরণ নিয়ে আধুনিক পন্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। মাসিদা-সন্তুষকে রাজশাহী জেলার মাহিসন্তষ হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে।[৭৯] অপরপক্ষে নারকুটীকে শাব্দিক মিলের কারণে নাটারী বা বর্তমানের নাটোরের পক্ষে অভিমত পেশ করা হয়েছে।[৮০] মাসিদা-সন্তুষ বা মাহিসন্তষ ইকতা বা প্রশাসনিক বিভাজনের মুকতা ছিলেন বখতিয়ার খলজীর বিশ্বস্ত সহচর ও উচ্চ সামরিক পদের অধিকারী ইয্যুদ্দীন মুহাম্মদ শীরান খলজী। মাহিসন্তষ থেকে উত্তর সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হতো। নাটারী বা বর্তমান নাটোরের মুকতা ছিলেন আলাউদ্দীন আলী মর্দান খলজী। ইনিও বখতিয়ার খলজীর সামরিক বাহিনীতে সৈন্যাধক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, হুসামউদ্দীন ইওয়ায খলজী (পরবর্তীতে গিয়াস উদ্দীন ইওয়ায খলজী) শীরান খলজী এবং মর্দান খলজী লাখনাবতী সাম্রাজ্য বিজয়ের সময় বখতিয়ার খলজীর সৈন্যধ্যক্ষ হিসেবে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। পরে শীরান খলজী এবং ইওয়ায খলজী বখতিয়ার খলজীর পূর্ণ অনুগত ছিলেন। কিন্তু আলী মর্দান খলজী অত্যধিক উচ্চভিলাষী হয়ে উঠেন এবং তাঁর স্বগোত্রীয় নেতা বাংলা বিজয়ী গাযী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গিয়ে হত্যা করেন।[৮১] কেউ কেউ এটি সমর্থিত মত নয় বলে উল্লেখ করেন। আলী মর্দান খলজীর ইকতা নাটারী থেকে বখতিয়ার খলজীর বিজিত অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের এক বিরাট অংশের প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

মুসলিম বিজয়ের শুরু থেকে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে রাজশাহী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এই জেলার প্রশাসনিক ইউনিট মাহীসন্তষ ও নাটারী বা

বর্তমান নাটোর বিজিত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ইসলাম প্রচারের জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করেছে। একটি মুসলিম সমাজ গঠনের জন্যে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রসিদ্ধ মসজিদ ও মাদ্রাসা ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রেখেছে। বিজয়ের পর পর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী এবং খলজী আমীর ও অমাত্যগণ রাজধানী শহর লাখনাবতী ছাড়া বিজিত অঞ্চলের প্রশাসনিক বিভাজনের সামরিক ও কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের অগ্রযাত্রার পথ সুগম করেছিলেন। মাহিসন্তষে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীকালে এই শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহের (শাসন-কাল ১৪৫৯-১৪৭৪ খৃঃ) আমলে এখানে একটি টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির নাম হয় বারবাকাবাদ টাঁকশাল। এই স্থানটি বাংলার ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে মুঘল সম্রাট আকবরের সরকার বারবাকাবাদের নামকরণ হয় এই বারবাকাবাদের নামানুসারে। মাওলানা তাকীউদ্দীন আল আরাবী এই মাহিসন্তষে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই মাদ্রাসায় বাংলার বাহির থেকে শিক্ষার্থিগণ এসে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করতেন। প্রশাসনিক বিভাজন নাটারী বা নাটোরে অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। রাজশাহীর বাঘা বাংলা বিজয়ের সময় না হলেও পরবর্তীকালে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত হয় এবং কসবা পর্যায়ে উন্নীত হয়ে তা কসবা বাঘা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এখানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এ সবের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

---

১. *মিশকাত আল-মাসাবীহ* (করাচীঃ নূর মুহাম্মদ লাইব্রেরী) কিতাব আল-ইলম, পৃঃ ৩২, ৩৫।

২. নাসায়ী, *আস্-সুনান*, কিতাব আল-জিহাদ 'বাব গাযওয়া আল-হিন্দ'; কাযী আতহার মুবারকপুরী, *খুলাফায়ে রাশেদীন আওর হিন্দুস্তান* (দেহলী, ১৯৭২) পৃঃ ৩

৩. A. Karim, *Social History of the Muslims in Bengal* (Chittagong; Baitush Sharaf Islamic Research Institute, 2nd edition, 1985), p. 26.

৪. Sayyida Ismail Kashif, ``Alaqat al-Sin (China) bi Diyar al-Islam'', *Magazine of the Faculty of Archaeology*, Cairo University, 1976, p. 33; T. W. Arnold, *The Preaching of Islam* (Lahore ; Shaikh Muhammad Ashraf, Reprint, 1956), p. 295.

৫. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. I (Karachi : Pakistan Historical Society, 1963), p. 37; Proceedings of Pakistan History Conference, Karachi, 1951, pp. 192-93.

৬. A. K. M. Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Barind, 1200-1575 A. D.* (Unpublished Ph. D. Thesis), p. 186 (Henceforth *ASCB*).

৭. শাহ সুলতান মাহমুদ মাহী সওয়ার বগুড়া শহরের সাত মাইল উত্তরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানে শায়িত আছেন। এই সূফী–সাধক কোন্ সূফী তরীকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। উপাখ্যানের সূত্রে জানা যায় যে, তিনি বলখের রাজকুমার ছিলেন। পার্থিব বৈভবের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন। তিনি দামিশ্‌কের শাইখ তাওফীকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় কামালিয়াত প্রাপ্ত হয়ে তাঁর মুরশিদের নির্দেশে বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে আসেন। সমুদ্র পথে এসে তিনি প্রথমে পূর্ববাংলার হরিরাম নগরে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে মহাস্থানে আসেন, এবং রাজা পরশুরামের সাথে তাঁর সংঘর্ষে রাজা স্ববংশে নিহত হন। তান্ত্রিক ও যোগশাস্ত্রে পারদর্শিনী রাজার ভগ্নি শিলাদেবী করতোয়া নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। মাহী সওয়ারের এই বিজয়ের তারিখ কোন কোন অসমর্থিত সূত্রে ৪৩৯ হিজরী/১০৪৭ খৃষ্টাব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ১২০৩ ও ১২০৪ খৃষ্টাব্দ অথবা এই দুই বছরের মধ্যবর্তী সময়ে এই বিজয় সাধিত হওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয়। তিনি প্রকৃত মাছের পিঠে অথবা মৎস্যাকৃতি নৌকায় আরোহণ করে এসেছিলেন বলে তাঁকে সুলতান মাহী সওয়ার (মৎস আরোহী) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ

Journal of the Asiatic Society of Bengal (JASB), Part I, 1875, No. 2, pp. 183-86; *JASB*, part I, 1878, No. I, pp. 91-95; পি. সি. সেন, *বগুড়ার ইতিহাস*, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭০–৭৬; A. Karim, *Social History*, pp. 88-89; Enamul Haq, *A History of Sufiism in Bengal*, pp. 205-209; *ASCB*, pp. 223-225.

৮. উপাখ্যানের সূত্রে জানা যায় যে, রাজা বল্লাল সেন এবং শাহ তুরকানের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে শাহ তুরকান শাহাদাতবরণ করেন। শেরপুরে তাঁর দেহ যে স্থানে সমাহিত হয়েছে তা ধর মোকাম এবং যে স্থানে মস্তক সমাহিত হয়েছে তা শির মোকাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। রাজশাহী শহরের দরগাপাড়ায় সমাহিত শাহ তুরকান এবং শেরপুরের শাহ তুরকান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, এই বল্লাল সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন নয়। সম্ভবত তিনি শেরপুরের কোন

সামন্ত শাসক হবেন এবং মুসলিম বিজয়ের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন এক দশকে তাঁর সাথে শাহ তুরকানের সংঘর্ষ হয়ে থাকবে। বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ Hunter, *Statistical Account of Bengal : Bogra District*, p. 190; প্রভাস চন্দ্র সেন, *বগুড়া ইতিহাস*, ১ম, খন্ড, পৃঃ ৮৬–৮৭; *ASCB*, pp. 226-227

৯. এই সূফী–সাধকের মাকবারা পাবনা জেলার শাহজাদপুরে অবস্থিত। কথিত আছে যে, মখদুম শাহ দাওলা মহানবী (সা)–এর প্রখ্যাত সাহাবা হযরত মুয়ায বিন জাবালের একজন বংশধর ছিলেন। তিনি ইয়ামেন থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় এসে শাহজাদপুরে অবস্থান করেন। বিহারের একজন হিন্দু রাজা তখন এ অঞ্চল শাসন করতেন। কোন বিদেশী এবং বিশেষ করে একজন মুসলমানের স্থায়ীভাবে বসবাস করা এবং ইসলাম প্রচার রাজা সহ্য করতে পারেননি। রাজা এই সূফী– সাধককে তাঁর অনুচরসহ বিতাড়িত করার জন্যে সংঘর্ষ বাধান। শাহ দাওলা তাঁর সঙ্গী–সাথীসহ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ

JASB, part I, 1904, No. 3, pp. 267-71; *Bengal District Gazetteers ; Pabna*, 1923, pp. 121-26; A. Karim, *Social History*, pp. 86-87; Enamul Haq, *History of Sufiism*, pp. 215-18; *ASCB*, pp. 228-29.

১০. সমর্থিত সূত্রে জানা যায় যে, আবুল কাসিম মখদুম শাইখ জালাল উদ্দীন তারবীযী পারস্যের তাবরীয নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ সাইদ তাবরীযীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দির অধীনে আধ্যাত্মিক সাধনায় কামালিয়াত অর্জন করেন। তিনি তাঁর মুরশিদকে গরম খাবার পরিবেশনের উদ্দেশ্যে কাবা শরীফে হজ্জ যাত্রা পথে সব সময় একটি উত্তপ্ত চুলা মাথার উপর রাখতেন। মুরশিদের অনুমতি নিয়ে তিনি দিল্লীতে আসেন এবং সুলতান ইলতুতমিশ (শাসনকাল ১২১০–১২৩৬ খৃঃ) কর্তৃক সমাদৃত হন। দিল্লীতে কিছুকাল অবস্থান করে তিনি বাংলায় আগমন করেন। কিন্তু লক্ষণ সেনের অমাত্য হলায়ধু মিশ্র রচিত (পরবর্তীকালে রচনা করে হলায়ুধ মিশ্রের নামে চালান হয়েছে) শেক শুভোদয় গ্রন্থে তাঁকে ভারতের অটটাব প্রদেশের ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং লক্ষণ সেনের দরবারে তাঁর আগমন নির্দেশ করা হয়েছে। এই সূফী–সাধকের অলৌকিক কাজ দেখে লক্ষণ সেন তাঁর ইসলাম প্রচারের সুবিধার জন্যে মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করে দেন। জালাল উদ্দীন তাবরীযী সম্পর্কে শেক শুভোদয়ে বর্ণিত ঘটনা সমর্থনযোগ্য নয়।

বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দৃষ্টব্য ঃ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, *আখবার আল–আখইয়ার*, উর্দু অনুবাদ মাওলানা সুবহান মাহমুদ (করাচীঃ মদীনা পাবলিশিং কম্পানী), পৃঃ ৯১–৯৬; *JASB*, part I, 1895, pp. 202 ff; A. Karim, *Social History*, pp. 91-96; Enamul Haq, *History of Sufiism*, pp. 160-68; *ASCB*, pp. 229-235.

১১. K. N. Dikshit, *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 55, Delhi, 1938, p. 87.

১২. এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম* (ঢাকাঃ আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং. ১৯৪৮) পৃঃ ১২।

১৩. H. M. Elliot & John Dowson ed., *History of India as told by its own Historians,* Vol. I (Allahabad: Kitab Mahal. Reprint, 1959). p. 5; S. Hodivala, *Studies in Indo-Muslim History,* Vol. II (Bombay: The Popular Book Depot, 1957), p. 4; *ASCB*, pp. 188-89;

আবদুল করিম, "বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ", *সাহিত্য পত্রিকা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, ১ম খন্ড, পৃঃ৮৬।

১৪. মিনহাজ সিরাজ, *তাবাকাত-ই-নাসিরী,* ১ম খন্ড পৃঃ ৪২৭।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩৬।

১৬. *Epigraphia Indo-Moslemica* (Henceforth *EIM*), 1917-18, p. 13, plate II.

১৭. *JASB,* 1870. pp.287-88 ; *EIM,* 1917-18, pp.33-88 ; 33-34, plate XII (a).

১৮. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* Vols. XXIV-VI, Dhaka, 1979-81, p. 32, plate XXII; *Islamic Studies,* Vol. XXIV, Islamabad, 1985 pp. 425-26.

১৯ Abid Ali. *Memoirs,* pp. 157-58; A. H. Dani, *Bibliography,* p. 49 ;

S. Ahmed, *IB.* Vol. IV,pp. 158-59 ; *Islamic Stadies,* Vol. XXIV, p. 426

২০. BPP. 1928, p. 144.

২১ .*Islamic Studies,* Vol. XXIV, p. 428 ; *মকতুবাত-ই-সাদী,* পৃঃ ৩৩৯।

২২. *Calcutta Review,* 1939, Nos. 1-3, p. 196; *মকতুবাত-ই-সাদী,* পৃঃ ৩৩৯-৪০

২৩. Qazi Ahmad Mia Akhtar, "Amrifund", *Journal of the Pakistan Historical Society (JPHS), Karachi,* 1953, Pp. 47 ff.

২৪. মিনহাজ সিরাজ, *তাবাকাত-ই-নাসিরী,* ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩৬।

২৫. রামাই পন্ডিত, *শূণ্য পুরাণ,* সম্পাদনা, এম. এন. বসু (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১৪০-১৪২।

২৬. আবু তালিব, *হযরত শাহ মখদুম রুপোশ-এর জীবনেতিহাস* (ঢাকাঃ পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ১৯৬৯), পৃঃ ৫৪।

২৭. প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৫২-৫৩।

২৮. প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৫৪

২৯. *ASCB,* Pp. 245-46.

৩০. Ibid.

৩১. S. Ahmed, IB, Vol. IV, Pp. 272-274.

৩২. *History of Sufiism,* p. 232.

৩৩. *IB,* Vol. IV, p. 272.

৩৪. আবু তালিব, *হযরত শাহ মখদুম,* পৃঃ ১০।

৩৫. IB. Vol. IV p.. 274.

৩৬. *রাজশাহী পরিচিতি* (রাজশাহী : বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০), পৃঃ ২০৩, ২০৪।

৩৭. *JASB,* 1904, part I, p. 110; *BPP,* 1928, p. 114.

৩৮. *The District of Rajshahi,* p. 83.

৩৯. A. H. Dani Bibliography, p. 68; S. Ahmed, IB, Vol. IV, p. 214.

৪০. S. Ahmed, *Inscriptions of Bengal,* Vol. IV (Rajshahi : Varendra Research Museum, 1960), p. 244 (Henceforth *IB*);

খন্দকার আখতার আলী , হযরত শাহ মখদুম ও মহাকাল গড়ের ইতিহাস , (রাজশাহী, ১৯৬৮), পৃঃ ১০-১২, ১৪-১৫, ২৫-২৬ ও ৪৫-৪৭ ;

S. A. Akanda (ed.), *The District of Rajshahi : Its Past and Present* (Rajshahi : The Institute of Bangladesh Studies, 1983), Pp. 43, 82-83.

৪১. *রাজশাহী পরিচিতি,* (রাজশাহী : বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০), পৃঃ ২০৫।

৪২. আবু তালিব, *হযরত শাহ মখদুমের জীবনেতিহাস* (ঢাকা : পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ১৯৬৯), পৃঃ ৬৭-৬৮।

৪৩. *The District of Rajshahi : Its Past and Present,* p. 84.

৪৪. Abid Ali Khan, *Memoirs of Gaur and Pandua* (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1924) p. 83, (Henceforth *Memoirs.*)

৪৫. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal* (Delhi : D. K. Publishing House, 1974), p. 58; The District of Rajshahi, op. cit., p. 84.

৪৬. *Memoirs,* op. cit., p. 65; *The District of Rajshahi,* op. cit., p. 84.

৪৭. ইযাজুল হক, *তাযকিরা-ই-সুফিয়া-ই-বাঙ্গালা* (লাহোর : মারকাযী বোর্ড, ১৯৬৩), পৃঃ ৪২০।

৪৮. শাহ শুয়াইব, *মানাকিব আল-আসফিয়া* (সারসংক্ষেপ *মাকতুবাত-ই-সাদী*-এর পরিশিষ্টে প্রকাশিত) পৃঃ ৩৩৯ ;

The District of Rajshahi, op. cit., p. 67.

৪৯. S. H. Askari, "New Light on Rajah Ganesh and Sultan Ibrahim Sharqi of Jawnpur from contemporary correspondence of two Muslim Saints", *Bengal Past and Present,* Calcuttta, 1948, No. 130, p. 35 (Henceforth *BPP*).

৫০. শ্রী কালী নাথ চৌধুরী, রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (হুগলী, ১৯০১) পৃঃ ২৬৬।

৫১. প্রাগুপ্ত, পৃঃ ২৬৬।

৫২. প্রাগুপ্ত, পৃঃ ২৬৬।

৫৩. মরহুম শাইখ বাসতুল্লাহর চার পুত্র ও এক কন্যা। সবাই উচ্চ শিক্ষিত এবং জীবিত। কেউ এখন বাড়িতে থাকেন না। পুত্রগণ যথাক্রমে শাইখ মুহাঃ ইজ্জতুল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী),

অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, ডঃ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী (প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ডাঃ এ, বি, এম, মাহমুদুল হক (সরকারী হাসপাতালে সিভিল সার্জন)। কন্যা মিসেস জোহরা খাতুন, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে রাজশাহীতে স্বামীর ঘরকন্না করেন। ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তাঁরা তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন।

৫৪. মিনহাজ সিরাজ, *তাবাকাত-ই-নাসিরী* (১ম খন্ড কাবুল ঃ হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অব আফগানিস্তান, ১৯৬৩) পৃঃ ৪২৭।

৫৫. এই শিলালিপিটি ভারতীয় যাদুঘরে (কলিকাতা) সংরক্ষিত আছে। দ্রষ্টব্য ঃ *ASR*, Vol. XV, p. 76; *JASB*. Vol. LXIV. 1895, Pp. 222-23; Abid Ali. *Memoirs*, p. 77; A. H. Dani, *Bibliography*. p. 31; G. Ahmed. *IB*. Vol. IV, Pp. 104-105.

৫৬. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* Vols. XXIV-VI. 1979-81. Dhaka p. 32.

৫৭. *Islamic Studies*. Vol. XXIV. 4. Islamic Research Institute. Islamabad, 1985. Pp. 425-26.

৫৮. A. H. Dani, *Bibliography*, p. 68; S. Ahmed. IB, Vol. IV p. 214; *Islamic Studies*, Vol. XXIV, p. 427.

৫৯. J. N. Sarker. "A Description of North Bengal in 1609 A. D.", *Bengal Past and Present* (BPP), 1928, p. 144.

৬০ *Islamic Studies*, Vol. XXIV. P. 427.

৬১. *মানাকিব আল-আসফিয়া* (মকতুবাত-ই-সাদী), পৃঃ ৩৩৯।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৯।

৬৩. H. N. Wright, *Catalogue of the Coins in the Indian Museum,* Calcutta *(IMC)*, Vol. II (London : Oxford University Press. 1907), P. 171. Coin No. 163; A. Karim, Corpus of the Muslim Coins of Bengal (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1960), p. 162; *The District of Rajshahi*, p. 68.

৬৪. বিপ্রদাস, *মনসা বিজয়*, সম্পাদনা, সুকুমার সেন (কলিকাতা ঃ এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৫৩), পৃঃ ৬৭; মুকুন্দ রাম, *কবি কঙ্কন চন্ডী*, সম্পাদনা-শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় (কলিকাতা ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), পৃঃ ৩৪৫।

৬৫. মুকুন্দ রাম, কবি কঙ্কন চন্ডি, পৃঃ ৩৪৩।

৬৬. P. C. Bagchi, "Political Relation between Bengal and China in the Pathan Period", *Visva Bharati Annals*, Vol. I. Calcutta. 1945. p. 124.

৬৭. তিরমিযী, *আল-জামি'* (করাচী ঃ নূর মুহাম্মদ লাইব্রেরী), পৃঃ ২১১, *মিশকাত আল-মাসাবীহ* (করাচী ঃ নূর মুহাম্মদ লাইব্রেরী), পৃঃ ৩২৪।

৬৮. Abul Fadl 'Allami, *Ain-i-Akbari,* Vol. I. Tr. H. Blochman (Calcutta : Asiatic Siciety of Bengal, 1904), p. 110.

৬৯. *JASB*, Vol. XLII, Part I, 1873, Pp. 282-86; Abid Ali, *Memoirs*, p. 87; *Islamic Studies*, Vol. XXIV, p. 433.

৭০. A. Karim, *Social History of the Muslims in Bengal* (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1959), p. 80.

৭১ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ S. Ahmed. *Inscriptions of Bengal,* Vol. IV (Rajshahi : Varendra Research Museum, 1960); A. K. M. Yaqub Ali. *Select Arabic and Persian Epigraphs* (Dhaka : Islamic Foundation, Bangladesh 1988).

৭২. A. K. M. Yaqub Ali. "Two Unpublished Arabic Inscriptions", *Journal of the Varendra Research Museum, (JVRM)*, Vol. 6, Rajshahi. P. 106; *Select Arabic and Persian Epigraghs*, op. cit., p. 46; *Islamic Studies*, Vol. XXIV. 4. Pp. 434-35.

৭৩. *JASB*, 1904, part I, p. 110; *BPP*, 1928, p. 114.

৭৪. *Islamic Studies*. Vol. XXIV, 4. Pp. 434, 443, f. n. 71.

৭৫. A. H. Dani, "Date of Bakhtiyar's raid on Nadiya". *Indian Historical Quarterly (IHQ)*, Vol. XXX, Calcutta, 1954, p. 145; আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭) পৃঃ ৮১।

৭৬. *তাবাকাত-ই-নাসিরী*, প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৪২৬

৭৭. J. N. Sarker (ed), *History of Bengal*, Vol. II (Dacca : Dacca University. Second Impression, 1972), p. 5.

৭৮. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, *তাবাকাত-ই-নাসিরী* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃঃ ২৬৮-২৭৩।

৭৯. The District of Rajshahi, pp. 65-66.

৮০. A. M. Khan. "Successors of Ikhtiyaruddin Muhammad Bakhtiyar Khalji". *Indian Culture*, Calcutta. 1944. p. 45, f. n. 2.

৮১. *তাবাকাত-ই-নাসিরী*, প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৪৩২।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থাপত্য, লিপি ও শিল্পকলা

স্থাপত্যের প্রকৃতি এবং রাজশাহী জেলার স্থাপত্য নিদর্শন

তুর্কী মুসলমানগণ এক উন্নত স্থাপত্য ঐতিহ্য নিয়ে বিজয়ীবেশে বাংলায় প্রবেশ করেন। তাঁরা যে স্থাপত্য অভিজ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন তা এ দেশের স্থাপত্য কাঠামোতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। মধ্য এশিয় এবং পারসিক প্রভাব বাংলার স্থাপত্যিক অবকাঠামোতে ও অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে বিজয়ী মুসলমানগণ তাঁদের সুচিন্তিত ইমারত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে এ দেশের কারিগর, স্থাপত্য কৌশলী ও অলঙ্করণ শিল্পীদের নিয়োগ করেছেন। ফলে মুসলিম শাসনামলে গড়ে ওঠা এ দেশের স্থাপত্য ইমারতগুলোতে দেশীয় ও আঞ্চলিক অনেক বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে। বিভিন্ন উৎস পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এ দেশে মুসলিম শাসনামলে যে স্থাপত্য ইমারত গড়ে উঠেছিল তা প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়, এক. ধর্মীয় স্থাপত্য এবং দুই. লৌকিক স্থাপত্য। সাধারণভাবে ইবাদতের জন্যে মসজিদ, জ্ঞান-অর্জন ও পঠন-পাঠনের জন্যে মাদ্রাসা, ধর্মীয় প্রশিক্ষণ ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে খানকা এবং মৃত ব্যক্তির কবরের উপর নির্মিত মাকবারা ধর্মীয় স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে শাসকদের বাসস্থানের জন্যে প্রাসাদ, রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যে দুর্গ ও দুর্গ-প্রাকার, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্যে নদীর উপর নির্মিত সেতু, সেনাবাহিনীর জন্যে সেনাছাউনি এবং প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্যে প্রশাসন ভবন লৌকিক স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত। এসব ইমারতের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় ধনুক-বক্র ছাদ, চৌচালা ও পিয়ালা সাদৃশ্য গম্বুজ প্রভৃতি এদেশীয় নির্মাণ-কৌশলের প্রতিধ্বনি করে। অনুরূপভাবে অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় পোড়ামাটির ফলকে উপস্থাপিত এবং শিলাগাত্রে ক্ষোদিত দেশীয় লতাগুল্মের

অনুকৃতি ও শিকল ঘন্টা প্রতিকৃতি এ দেশের শিল্পকলার প্রতিনিধিত্ব করে। মুসলিম শাসন আমলকে আমরা সুলতানী যুগ এবং মুঘল যুগে বিভক্ত করে স্থাপত্যের উপর সমীক্ষা নিতে পারি। সুলতানী যুগ ১২০৪ খৃষ্টাব্দে লাখনাবতী সাম্রাজ্য বিজয় থেকে শুরু করে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের বাংলা বিজয় পর্যন্ত গণ্য করা হয়। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয় পর্যন্ত মুঘল যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুঘল যুগে গড়ে ওঠা স্থাপত্যে সুলতানী যুগের স্থাপত্য হতে বিভিন্নতার ছাপ অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।

সুলতানী আমলের স্থাপত্য ইমারতের অবকাঠামো, পরিমিত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমরা সেগুলোকে চারটি স্তর বা পর্যায়ে বিন্যস্ত করতে পারি। এক. প্রারম্ভিক পর্যায়, দুই. গঠন ও বিকাশ পর্যায়, তিন. চূড়ান্ত পর্যায় এবং চার. ক্রমোবনতি পর্যায়।[১] প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিজয়ী মুসলমান ও শাসকগণ তাঁদের দেশের স্থাপত্য পরিকল্পনাকে এ দেশের স্থাপতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ স্থলে তুর্কী ও মধ্য এশীয় স্থাপত্যরীতি এ দেশের স্থাপত্যে অনুসৃত হয়েছে। যুগপ্যভাবে তাঁরা অন্য মুসলিম দেশসমূহের স্থাপত্যরীতি ও কৌশল তাঁদের ইমারতের নির্মাণ পদ্ধতিতে অনুসরণ করেছেন। তবে এই পর্যায়ে তাঁরা স্থানীয় নির্মাণ কৌশলী ও অলঙ্করণ শিল্পীকে নিয়োগ করে তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এই প্রারম্ভিক পর্যায় ১২০৪ খৃষ্টাব্দে মুসলিম বিজয় থেকে শুরু করে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান পর্যন্ত প্রসারিত। এই পর্যায়ে হযরত পাণ্ডুয়ায় আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ বিন ইলিয়াস কর্তৃক ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত আদিনা জামে মসজিদ [২] একটি উল্লেখযোগ্য মুসলিম স্থাপত্যের উদাহরণ হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সিকান্দার শাহ তাঁর এই জামে মসজিদের ভূমি ও স্থাপত্য পরিকল্পনা সম্ভবত উমাইয়া খলীফা আল-ওয়ালীদের দামিশ্‌কে নির্মিত জামে মসজিদের পরিকল্পনা থেকে গ্রহণ করেছেন।[৩] ইসলামের প্রাথমিক যুগের পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মসজিদের পরিকল্পনা সামনে রেখে সিকান্দার শাহ এই আদিনা মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। তবে বাংলার বর্ষণমুখর আবহাওয়ার সাথে এরূপ পরিকল্পনার মসজিদ উপযোগী না হওয়ায় পরবর্তী অন্য কোন মসজিদে তা অনুসৃত হয়নি।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী এবং তাঁর খলজী আমীর ও অমাত্যগণ বিজিত অঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা নির্মাণ করেছেন।[৪] এছাড়াও বাস করার জন্যে বাসগৃহ এবং শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে দরবার কক্ষ বা প্রশাসনভবন তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রাথমিক পর্যায়ের পরবর্তী শাসকগণও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এ ধারা ও রীতি বজায় রেখেছেন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সাধারণভাবে এই সময়ের স্থাপত্য ইমারতের অস্তিত্ব বজায় নেই। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেনীতে নির্মিত জাফর খান গাযী মসজিদ [৫] (ইট পাথরের সমন্বয়ে নির্মাণ পদ্ধতি অনুসরণে) এবং হযরত পাণ্ডুয়ায় (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত) আদিনা মসজিদ (অনুরূপ পদ্ধতিতে নির্মিত) স্থাপত্যিক নিদর্শন হিসেবে সে সময়ের স্থাপত্য ধারা ও রীতি আমাদের অনুধাবনের জন্যে ক্ষয়িত অবস্থায় ধরে রেখেছে। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব রকমের স্থাপত্য নিদর্শন বিলীন হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, সম্ভবত সেসব স্থাপত্যের নির্মাণ উপকরণ ছিল রৌদ্রস্নাত ইট অথবা পোড়া ইট যা প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অস্তিত্ব টিকে রাখতে পারেনি।[৬] ফলে এই সময়ের স্থাপত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সম্ভব হয় না। সমকালীন মুসলিম বিশ্বে এবং বিজয়ী ও বহিরাগত মুসলমানদের দেশে গড়ে ওঠা স্থাপত্যের অনুকরণে প্রাথমিক পর্যায়ে এ দেশের স্থাপত্যরীতি যাত্রা শুরু করেছিল বলে আমরা অভিমত ব্যক্ত করতে পারি।

বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে রাজা গণেশ বংশের স্থাপত্য ইমারত গঠন ও বিকাশ পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সময়ের স্থাপত্যে বৈদেশিক ও স্থানীয় নির্মাণ রীতি ও কৌশলের সুসম সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং তার ফলে বাংলার স্থাপত্যে একটি সংমিশ্রিত স্থাপত্যরীতি আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নতুন স্থাপত্যরীতি পরবর্তী ইমারতসমূহের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। হযরত পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত রাজা গণেশের পুত্র সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের (পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সূফী-সাধক হযরত নূর কুবতুল আলমের হাতে ইসলাম গ্রহণ) বলে সনাক্তকৃত এক লাখী সমাধি-সৌধ রিকাশ পর্যায়ের সংমিশ্রিত স্থাপত্যরীতির

উদাহরণ বহন করে।[৭] এটির নির্মাণ উপকরণ হচ্ছে পোড়া ইট। বাংলার বাঁশ দিয়ে গৃহ নির্মাণের বৈশিষ্ট্যসমূহ ইট নির্মিত এক লাখী সমাধি-সৌধে উপস্থাপিত হয়েছে। এই ইমারতের চার কোণে চারটি স্থূলাকার অষ্টকোণাকৃতি টাওয়ার বা সংলগ্ন স্তম্ভ বাংলার ঢালু ছাদ বিশিষ্ট খড়-বাঁশগৃহের চার কোণের বাঁশের মোটা চারটি খুঁটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে এই ইমারতের অবয়ব কাঠামোকে ছনের ঘরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এবং তার কার্নিশ ও ছাদ-পৃষ্ঠকে বাঁশ গৃহের ন্যায় ঢালু করা হয়েছে যাতে করে বৃষ্টির পানি তড়িৎ গতিতে নিচে নেমে যেতে পারে। এ সবের পাশাপাশি কুইন্চ (খন্ডাংশ খিলান), লিন্টেল (সর্দল) ও খিলানের সমন্বিত উপস্থাপন নির্দেশ করে যে, এই ইমারতে দেশী ও বৈদেশিক স্থাপত্যরীতির এক সুসম সংমিশ্রণ ঘটেছে।[৮] এতদসত্ত্বেও এ দেশীয় কারিগর ও নির্মাণ শিল্পীগণ বাঁশ নির্মিত গৃহের বৈশিষ্ট্যাবলী এতে উপস্থাপিত করে এটিকে সংমিশ্রিত স্থাপত্যের একটি স্থানীয়, অথচ আদর্শ ও অনুকরণীয় স্থাপত্যিক নিদর্শন হিসেবে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এই উপমহাদেশের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রফেসর আহমদ হাসান দানীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়, "But for the hemispherical dome that covers the roof, the building tries to represent in brick all those features that characterise a bamboo hut. With the evolution of this building the Muslim architecture in Bengal found for the time being a solution of its architectural demands, in which the local characteristics were impressed over the general Muslim pattern."[৯] (কেবলমাত্র অর্ধ গোলাকৃতি গম্বুজ-এর জন্যে যা ছাদকে পরিবৃত করেছে, এই ইমারত ইটের কাঠামোয় ঐ সব বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেছে যা বাঁশের কুঁড়েঘরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই ইমারতের বিবর্তনে বাংলায় মুসলিম স্থাপত্য সাময়িকভাবে স্থাপত্যিক চাহিদার এমন এক সমাধান খুঁজে পেয়েছে সেখানে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যাবলী মুসলিম স্থাপত্যের সাধারণ কাঠামোয় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।)

বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী (১৪৩৭-১৪৮৬ খৃঃ) এবং হুসাইন শাহী (১৪৯৩-১৫৩৮ খৃঃ) বংশের শাসনামলে গড়ে ওঠা ইমারতসমূহ চূড়ান্ত পর্যায়ের স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই সময়ে বাংলার রাজধানী শহর ছাড়াও দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা, সেতু, চিল্লাখানা ও দুর্গ এক সুষ্ঠু স্থাপত্যিক পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে। এ সবের মধ্যে মসজিদ স্থাপত্য মুখ্য ও প্রধান স্থাপত্য কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। এ সময়ের স্থাপত্য কর্ম নিজস্ব গতিতে এবং সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য নির্মাণ শৈলীতে বিকাশলাভ করে বাংলার স্থাপত্যের শীর্ষে অবস্থান করছে। রাজশাহী জেলার সুলতানী যুগের স্থাপত্য এ সময়ের অন্তর্ভুক্ত। এর পর বাংলার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ক্রমোবনতি যুগ শুরু হয়। সাধারণত ১৫৩৮ খৃস্টাব্দে হুসাইন শাহী বংশের শেষ থেকে ১৫৭৬ খৃস্টাব্দে মুঘলদের বাংলা অধিকার পর্যন্ত এই সময়ের বিস্তৃতি ধরা হয়। এ সময়কালে শুরী ও কররানী বংশ স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করে। এই সময়ের স্থাপত্যে হুসাইন শাহী আমলের স্থাপত্যধারা অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ডামাডোলের জন্যে শাসকগণ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের দিকে যথাযথ দৃষ্টি দিতে পারেননি । সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় স্থাপত্য শিল্প উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি।[১০] ফলে স্থাপত্যিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়েছে এবং স্থাপত্য তার পূর্বের জৌলুস হারিয়ে ফেলে সাদামাঠাভাবে দু'একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এই পর্যায়ে রাজশাহী জেলার কুসুম্বা মসজিদের উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। এরপর আসে মুঘল যুগ। মুঘল যুগের স্থাপত্য সুলতানী যুগের স্থাপত্য থেকে নির্মাণ কৌশল ও প্রক্রিয়ার দিক থেকে অনেকটা ভিন্নতর। রাজশাহীর গৌড়াঞ্চলের শাহ সুজার মসজিদ ও শাহ নিয়ামাতুল্লাহর মাকবারা বা সমাধি-সৌধ মুঘল স্থাপত্যের প্রাদেশিক পর্যায়ভুক্ত।

রাজশাহী জেলায় গড়ে ওঠা স্থাপত্যের প্রায় সবগুলো মসজিদ। এসবের মধ্যে অনেকগুলো এখনও টিকে আছে এবং কিছু ধ্বংস হয়ে স্বাক্ষর রেখে গেছে। এসব মসজিদের ভূমি পরিকল্পনা ও স্থাপত্যরীতি আলোচনা করার পূর্বে মসজিদ স্থাপত্যের একটি সাধারণ ধারণা দেয়ার প্রয়াস পাব। ইসলামে মসজিদ নির্মাণ উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে মসজিদ নির্মাণের উপর প্রভূত গুরুত্ব

আরোপিত হয়েছে। মসজিদ নির্মাণকে ঈমানের বহিঃপ্রকাশের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং নির্মাণকারীর জন্যে বেহেশতে অনুরূপ গৃহ বরাদ্দের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এজন্য মহনবী (সা) মদীনায় হিজরত করে প্রথম কাজ হিসেবে মসজিদ নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। মহানবী (সা)–এর এই আদর্শের অনুকরণে মুসলমানগণ যে দেশ বা অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন সেখানে তাঁরা মসজিদ নির্মাণ করে তাঁদের দীন ও হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বাংলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাদামাঠাভাবে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু পরবতীকালে বিভিন্ন ধারা থেকে গৃহীত স্থাপত্য শৈলী মসজিদকে একটি বিশিষ্ট স্থাপত্যিক রূপ দান করেছে। অন্যান্য ইমারতের ন্যায় একটি মসজিদের জন্যে থাকে ভূমি পরিকল্পনা, নির্মাণ রীতি এবং অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্য ।

ভূমি পরিকল্পনার দিক বিবেচনা করে মসজিদকে বর্গাকৃতি এবং আয়তাকার হিসেবে বিন্যস্ত করা যায়। মহানবী (সা)–এর মদীনার মসজিদ ছিল বর্গাকৃতি এবং এটির অনুসরণে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মসজিদসমূহ বর্গকৃতি ভূমি পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আয়তকার ভূমি পরিকল্পনায় মসজিদ নির্মিত হয়েছে। আব্বাসীয় আমল থেকে সাধারণত এই ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের মসজিদসমূহ এবং বিশেষ করে রাজশাহী জেলাস্থিত মসজিদগুলো সাধারণত এই আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে উমাইয়া মসজিদের ন্যায় আমাদের দেশের মসজিদসমূহের প্রশস্ত বাহু কিবলামুখী হয় এবং হ্রস্ব বাহু পার্শ্ববতী দিকে সংস্থাপিত হয়। উমাইয়া খলীফা আল–ওয়ালীদ নির্মিত দামিশ্‌কের জামে মসজিদ এইরূপ পরিকল্পনায় নির্মিত । অপরপক্ষে আব্বাসীয় মসজিদ আয়তাকার হওয়া সত্ত্বেও মসজিদের হ্রস্ব বাহু কিবলামুখী এবং দীর্ঘ বাহু পার্শ্ববতী দিকে সংস্থাপিত হয়। সামাররা এবং আবু দূলাফস্থ আব্বাসীয় মসজিদ ঐ রূপ ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। বাংলার সুলতানী আমলে বর্গাকৃতি পরিকল্পনার মসজিদও নির্মিত হয়েছে।

একটি আদর্শ মসজিদে ভূমি পরিকল্পনার দিক থেকে প্রধান দুটি অংশ থাকে– একটি জুল্লাহ (ছাদ বিশিষ্ট অংশ বা উপাসনাকক্ষ) এবং অপরটি সাহন (উন্মুক্ত

অংশ) বা চত্বর। কিবলার দিকে ছাদ বিশিষ্ট অংশ বাদে সাহন বা চত্বরের অপর তিন দিকে যে ছাদ বিশিষ্ট করিডোর বা গমন পথ নির্মিত হয় তাকে স্থাপত্যের পরিভাষায় রিওয়াক বা আবেষ্টনী প্রাচীর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। জুল্লাহর ছাদের ভার ধারণের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরে স্তম্ভরাশি সংস্থাপিত হয় এবং তাতে আইল বা গলি পথ সৃষ্টি হয়। বাংলার সুলতানী আমলের মসজিদ স্থাপত্যে উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে ধাবমান দুটি অথবা তিনটি আইল এবং পূর্ব হতে কিবলা বা পশ্চিম দিকে ধাবমান তিন অথবা পাঁচটি গলিপথে জুল্লাহ বিভক্ত। বর্গাকৃতি পরিকল্পনার মসজিদ–ছাদ একটি গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত এবং আয়তাকার পরিকল্পনার মসজিদসমূহের ছাদ বিভাজন প্রক্রিয়া হিসেবে ছয়–দশ অথবা পনের গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মুঘল আমলের বাংলার বর্গাকৃতি পরিকল্পনার মসজিদ এক গম্বুজ বিশিষ্ট এবং আয়তাকার পরিকল্পনার মসজিদ এক আইল বা গলিপথ বিশিষ্ট হয় এবং তা তিনটি গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত থাকে। কিবলা নির্দেশিকা হিসেবে কিবলা প্রচীরে মিহরাব এবং আযান দেয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে মাযিনা বা মিনার নির্মিত হয়ে থাকে। খুতবা প্রদানের জন্যে মিম্বার বা বক্তিতা মঞ্চ জুল্লাহর অভ্যন্তরে মিহরাবের পার্শ্বে সংস্থাপিত হয়। অযুর জন্যে মসজিদের সাহন বা চত্বরে হাওযের ব্যবস্থা করা হয়। মসজিদের স্থাপত্যিক শৈলীতে গম্বুজ, টাওয়ার ও খিলানের ব্যবহার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মসজিদ সম্পর্কে প্রারম্ভিক এই আলোচনার আলোকে রাজশাহী জেলার বিদ্যমান কয়েকটি মসজিদের উপর একটি সমীক্ষা পেশ করার প্রয়াস পাব। প্রথমে সুলতানী যুগের মসজিদ নির্মাণ তারিখের ক্রমানুসারে এবং পরে মুঘল যুগের মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ধুনিয়াচক মসজিদ

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত সুলতানী আমলের গৌড়ের দক্ষিণ শহরতলীতে এই মসজিদটি পরবর্তী ইলিয়াস শাহী (আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) আমলে নির্মিত হয়েছিল। আবীদ আলী এই মসজিদকে খানিয়াদিঘী মসজিদ হিসেবে ধরে নিয়ে বর্ণনা দিয়েছেন, এবং তা ঠিক নয়। তিনি এটিকে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দাসহ এক গম্বুজ মসজিদ বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] ডঃ এ. এইচ.

দানী যদিও একে ধনিয়াচক হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি এটির এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ হওয়ার পক্ষে মত পেশ করেছেন।[১২] ডঃ মাহমুদ হাসান এটিকে এই আইল বিশিষ্ট তিন গম্বুজের মসজিদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[১৩] এসব মতের কোনটিও সঠিক বলে মনে হয় না। এসব মতপার্থক্যের কারণ হচ্ছে মসজিদটি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এর কিবলা বা পশ্চিম প্রাচীরটি বিদ্যমান রয়েছে এবং উত্তর প্রাচীরের কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। ব্যক্তিগতভাবে স্থানটি পরিদর্শন করে আমার যা মনে হয়েছে তাতে এটি ভূমি পরিকল্পনার দিক থেকে উত্তর হতে দক্ষিণে দুই আইল এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে তিন আইলের মোট ছয়টি বর্গাকৃতি পরিসর ছয় গম্বুজ ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। কারণ জুল্লাহ বা উপাসনা কক্ষের অভ্যন্তরে ছাদ ধারণের জন্যে বিদ্যমান দুইটি প্রস্তর স্তম্ভ এই মতের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায়। মসজিদটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৬২ ফুট এবং প্রস্থে ৪২ ফুট। মসজিদটি যেহেতু প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তার কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি সেহেতু তার নির্মাতা ও নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে কোন মত পেশ করা যায় না। তবে নির্মাণগত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলী বিবেচনা করে এটিকে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী মসজিদের তালিকাভুক্ত করা যায়।

দরসবারী মসজিদ

সুলতানী গৌড়ের দক্ষিণ শহরতলী এবং বৃহত্তর রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন ঘোষপুর মৌজায় দরসবারী মসজিদ অবস্থিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই মসজিদের গোটা ছাদ এবং কোণের টাওয়ারসমূহ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এসবের সংস্কারের ব্যবস্থা করে মসজিদটিকে পুনর্নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছে। এই মসজিদের ধ্বংসস্তূপ হতে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের শাসনামলের (১৪৭৪–১৪৮১ খৃঃ) একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শিলালিপিতে সুলতান কর্তৃক ৮৮৪ হিজরী/১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং তা এই মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৪] কারণ দরসবারী মসজিদের পরিকল্পনা এটির জামে মসজিদ হওয়া নির্দেশ করে। দরসবারী নাম থেকে এটি অনুমান করা

অযৌক্তিক নয় যে, এই মসজিদে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল। মসজিদে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা থাকে তার চেয়ে এই মসজিদে উন্নত ও উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। অথবা এর সংলগ্ন স্থানের মাদ্রাসার জন্যে এটির দরসবারী মসজিদ নাম হয়েছে। কারণ যাই হোক এটির দরসবারী মসজিদ নাম শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্যে যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তাহলে বলা যায় যে, সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ হিজরী ৮৮৪/১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে জামে মসজিদ হিসেবে দরসবারী মসজিদ নির্মাণ করেন।

দরসবারী মসজিদ দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত–জুল্লাহ বা নামায কক্ষ এবং পূর্বদিকে আচ্ছাদিত সংলগ্ন বারান্দা। আয়তাকার জুল্লাহ বা নামায কক্ষটি উত্তর থেকে দক্ষিণে দৈর্ঘ্য আভ্যন্তরীণভাগে ৯৯ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রস্থে ৩৮ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং বারান্দা প্রশস্তায় ১০ ফুট ৭ ইঞ্চি। জুল্লাহ বা নামায কক্ষ তিনটি অংশে বিভক্ত। মধ্যস্থিত প্রধান খিলান পথ এবং পার্শ্বস্থিত দুই বাহু। প্রধান খিলান পথের পরিমাপ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৩৮ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৭ ফুট ৯ ইঞ্চি। প্রধান ন্যাভ বা খিলান পথের দুই পার্শ্বের বাহুদ্বয়ের পরিমাপ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৩৮ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ৩৭ ফুট ৪ ইঞ্চি। মধ্যস্থিত প্রধান অংশের দুই পার্শ্বের নামায কক্ষ প্রত্যেকটি নয়টি বর্গাকৃতি পরিসরে বিভক্ত, এবং এই পরিসরগুলো গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। উত্তরাংশের কক্ষের উত্তর–পশ্চিম কোণের মজবুত অষ্টকোণাকৃতি স্তম্ভের অবস্থান থেকে অনুমান করা যায় যে, এইগুলো উপর তলার 'যানানা গ্যালারী' বা অভিজাত মহিলাদের নামায আদায়ের স্থানের ভারবাহী খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই স্থাপত্যিক প্রক্রিয়া ছোট সোনা মসজিদ ও কুসুম্বা মসজিদ–এ পরিলক্ষিত হয়। ছোট সোনা মসজিদের ন্যায় সম্ভবত মসজিদের বাহির দিক থেকে সিঁড়ি পথ বেয়ে উপর তলার এই নামায কক্ষে ওঠা–নামা করা যেতো। কোন কোন স্থাপত্য বিশেষজ্ঞের মতে শাসক এবং তাঁর পরিবার–সদস্যের জন্যে এই নামায কক্ষ ব্যবহৃত হতো। সে ক্ষেত্রে এটি 'যানানা গ্যালারী' হিসেবে অভিহিত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

পন্ডিতগণ এই মসজিদের মধ্যস্থিত ন্যাভ বা প্রধান খিলান পথের আচ্ছাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আবীদ আলী এবং এস. কে.

স্বরস্বতী পিপা-সাদৃশ্য কিংবা লম্বা ভল্ট (খিলান) দ্বারা এই মধ্যস্থিত অংশের আচ্ছাদনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[১৫] মধ্যস্থিত ন্যাভের এই আচ্ছাদন প্রক্রিয়া আদিনা ও গুনামনত মসজিদে পরিলক্ষিত হয়। ডঃ আহমদ হাসান দানী মত প্রকাশ করেন যে, ছোট সোনা মসজিদের ন্যায় এটি চৌচালা আকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং এই মত গ্রহণযোগ্য।[১৬] জুল্লাহর এই মধ্যস্থিত প্রধান অংশের ন্যায় বারান্দার মধ্যস্থিত প্রশস্ত অংশটিও চৌচালা আকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। বারান্দার প্রধান অংশের পার্শ্বস্থিত দু'টি বাহু মোট ছয়টি গম্বুজ ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, মসজিদের ছাদ ধসে যাওয়ার কারণে কোন্ স্থাপত্যিক প্রক্রিয়ায় ছাদ নির্মিত হয়েছিল সে সম্পর্কে এই সব মতামত উল্লেখ করা হলো।

মসজিদের পূর্বে অবস্থিত বারান্দায় সর্বমোট সাতটি খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ আছে। তবে মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটি অপর ছয়টি প্রবেশ পথ হতে প্রশস্ত। প্রবেশ পথের খিলানগুলো ইট নির্মিত মজবুত পিল্‌পা স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। বারান্দার ন্যায় নামায কক্ষে প্রবেশের জন্যে সাতটি দরজা আছে। মসজিদের কিবলা বা পশ্চিম প্রাচীরের প্রতিটি অংশে তিনটি করে মোট নয়টি মিহরাব আছে। মিহরাবের খিলানগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির খিলান নকশা দ্বারা সুশোভিত এবং সেসব অলঙ্কৃত ইটের ক্ষুদ্রাকায় খুঁটির উপর সংস্থাপিত। মিহরাবের অভ্যন্তর ভাগে লতাপাতা এবং বিভিন্ন অলঙ্করণ মটিফ উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও প্রবেশ পথের উপরি অংশে ক্ষুদ্র গোলাপ এবং তরুরাজির নকশা অংকিত হয়েছে। মোটকথা দরসবারী মসজিদ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমলের একটি অনুপম স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে অতীতের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করছে।

খানিয়াদিঘী মসজিদ

বালুসদিঘী এবং খানিয়াদিঘীর মধ্যবর্তী স্থানে এই মসজিদটি অবস্থিত। রাজশাহীর শিবগঞ্জ থানাধীন সুলতানী আমলের গৌড়ের দক্ষিণ শহরতলীতে এই মসজিদ'ট দাঁড়িয়ে আছে। এটি ইট নির্মিত মসজিদ এবং একটি প্রকান্ড গম্বুজ দ্বারা এটির নামাযকক্ষের ছাদ আচ্ছাদিত। এটির পূর্বদিক সংলগ্ন বারান্দা তিনটি অর্ধগোলাকৃতি

গম্বুজ ছাদ দ্বারা পরিবৃত ছিল। স্থূলকায় স্তম্ভ গম্বুজের ভার ধারণের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব দিকের মসজিদ প্রাচীরে তিনটি প্রবেশ পথ ছিল এবং সাইজ করা বাঁকানো ইট দ্বারা দেওয়াল গাত্র অলঙ্কৃত ছিল। এই মসজিদের পরিকল্পনা থেকে অনুমান করা যায় যে, এটি জামে মসজিদ ছিল না, বরং মহল্লা মসজিদ হিসেবে গণ্য করা যায়। নির্মাণ পদ্ধতি বিচার করে এটিকে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।[১৭]

ছোট সোনা মসজিদ

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত সুলতানী আমলের গৌড়ের দক্ষিণ শহরতলীর ফিরুযপুর মৌজায় এই ছোট সোনা মসজিদ অবস্থিত। এটি একটি আয়তকার পরিকল্পনার মসজিদ। এর নির্মাণ উপকরণ হচ্ছে পোড়া ইট ও পাথর। মসজিদের দেয়াল প্রাচীর পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছে এবং তাকে মূল কাঠামো হিসেবে রেখে বাহির ও ভিতর উভয় দিকে ভূমি থেকে নিয়ে ছাদ পর্যন্ত সাইজ করা শিলাখন্ড দ্বারা বিশেষ সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় আচ্ছাদিত করা হয়েছে। মসজিদের অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় সোনার প্রলেপ থাকায় এর সোনা মসজিদ নাম প্রচারিত হয়েছে এবং গৌড়ের আর একটি বৃহৎ আকৃতির মসজিদে সোনার প্রলেপ থাকায় তাকে বড় সোনা মসজিদ বলা হয়। সেটির তুলনায় এই মসজিদের আকৃতি ছোট হওয়ায় জনগণ এটিকে ছোট সোনা মসজিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথের উপরি অংশে সংস্থাপিত একটি আরবী শিলালিপির সূত্রে জানা যায় যে, (১৪৯৩-১৫১৯খৃঃ) আলীর পুত্র ওয়ালী মুহাম্মদ কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[১৮] উৎকীর্ণ লিপির শেষাংশে নির্মাণ তারিখ ছিল। কিন্তু সেই অংশের পাথর ভেংগে যাওয়ার কারণে এই মসজিদের সঠিক নির্মাণ তারিখ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের রাজত্বকালে ১৪৯৩ খৃঃ হতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের যে কোন সময়ে এটি নির্মিত হয়েছিল।

ছোট সোনা মসজিদ আকৃতিতে একটি আয়তকার মসজিদ যা উত্তর থেকে দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৮২ ফুট এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রস্থে ৫২ ফুট। এই মসজিদের পূর্ব দিকের সম্মুখভাগ জাঁকজমকপূর্ণভাবে অলঙ্কৃত হয়েছে। পূর্বদিকে নামাযকক্ষে

প্রবেশের জন্যে পাঁচটি খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ আছে। এসব খিলান বহু খাঁচ বা ফালিযুক্ত এবং খিলান পরিসর বলিষ্ঠ অথচ ক্ষুদ্রাকায় গোলাপ-প্রতিকৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথ আয়তকার ফ্রেমে সংস্থাপিত হয়েছে এবং লতাপাতার প্রতিকৃত দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। তবে মধ্যবর্তী প্রবেশ পথের আয়তকার ফ্রেমটি অলঙ্কৃত প্যানেল দ্বারা পরিবৃত এবং তার উপরে রয়েছে শিলা ফলকে উৎকীর্ণ-লিপি। ছাদের ছিদ-প্রাচীর এবং কার্নিশ, পানি গড়ানোর জন্যে ঢালু করে তৈরি করা হয়েছে এবং তার উপর ছাদের গম্বুজগুলো উদগত হয়েছে। ছাদের এই মধ্যবর্তী গম্বুজসমূহ বাংলা চৌচালা আকৃতিতে নির্মিত হয়েছে এবং পাশ্ববর্তী গম্বুজগুলো অর্ধগোলাকৃতি বা উল্টো পিয়ালা আকৃতিতে নির্মিত হয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণ পার্শ্বে তিনটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে এবং পূর্বদিকের দরজার ন্যায় এগুলো অলঙ্কৃত।

এই মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ উত্তর থেকে দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৭১ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রস্থে ৪০ ফুট ৬ ইঞ্চি। নামাযকক্ষের এই পরিসরটি পাথর স্তম্ভের দ্বারা লম্বমান তিনটি আইল বা সারি এবং পাঁচটি 'ব্যে' বা হ্রস্ব গলিপথে বিভক্ত হয়ে মোট পনেরটি বর্গাকৃতি পরিসর সৃষ্টি করেছে। মধ্যবর্তী 'ব্যে' বা খিলান পথ ১৪ ফুট ৫ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং পার্শ্ববর্তী খিলান পথগুলো ১১ ফুট ৪ ইঞ্চি প্রশস্ত। মধ্যবর্তী খিলান পথের ছাদ তিনটি বাংলা চৌচালা গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত। কিন্তু দুই পর্শ্বস্থিত বাহু বারটি অর্ধগোলাকৃতি বা উল্টো পিয়ালা সদৃশ্য গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মধ্যবর্তী ন্যাভ বা প্রশস্ত খিলান পথ এবং পার্শ্বস্থিত দুই বাহুর এই মসজিদ পরিকল্পনা হযরত পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদকে পরিকল্পনার দিক থেকে বহুলাংশে অনুসরণ করেছে। মসজিদটির উত্তর বাহুতে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি অভ্যন্তরীণ পরিসর আছে, যার উপর তলায় 'যানানা গ্যালারী' বা মহিলাদের নামাযকক্ষ অবস্থিত এবং তা প্রস্তর স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। উত্তর দিকের বহিপ্রাচীর থেকে একটি সিঁড়ি পথে এই কক্ষে প্রবেশ করা যায়। মসজিদের পশ্চিম প্রাচীরে পাঁচটি 'ব্যে' বা গলিপথ সমান্তরাল মিহরাব আছে এবং উপর তলার কক্ষটিতে একটি ছোট মিহরাব আছে। এই মসজিদের বাহির ও ভিতরের বিভিন্ন অংশে শিলাগাত্রে খোদাই পদ্ধতিতে নানা রকমের অলঙ্করণ মটিফ উপস্থাপিত হয়েছে।

লতাপাতা, গোলাপ, জ্যামিতিক নকশা, বিমূর্ত ও কল্পিত তরুরাজি এবং শিকল ঘন্টার প্রতিকৃতি পাথর গাত্রে অতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। পাথর খোদাই করে অলঙ্করণের এই মসজিদকে হুসাইন শাহী আমলের একটি উত্তম উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায়। এই মসজিদের পূর্বদিকে একটি খোলা চত্বর অবস্থিত।[১৯]

বাঘা মসজিদ

রাজশাহী শহর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঘার দূরত্ব হচ্ছে ২৫ মাইল। বাঘার গুরুত্ব সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাঘার প্রাচীন কীর্তির মধ্যে ইট নির্মিত একটি মসজিদ এখনও বিদ্যমান। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটির বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেছে। প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত একটি বিরাট উন্মুক্ত পরিসরে এই মসজিদ অবস্থিত। এই উন্মুক্ত পরিসরকে আব্বাসীয় আমলের মসজিদের যিয়াদা স্থাপত্যিক কৌশলের সাথে তুলনা করা যায়। উত্তর ও দক্ষিণের দুটি ফটক দিয়ে এই পরিসরে প্রবেশ করা যায়। এই মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথের উপরি অংশে একটি শিলালিপি দেয়ালগাত্রে সংযুক্ত আছে। এই উৎকীর্ণ লিপি হতে জানা যায় যে, সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ কর্তৃক ৯৩০ হিজরী/১৫২৩-২৪ খৃস্টাব্দে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।[২০]

পরিকল্পনার দিক থেকে এটি একটি আয়তাকার মসজিদ, যার পরিমাপ উত্তর থেকে দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৭৫ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৪২ ফুট ২ ইঞ্চি। এটির চার কোণে অষ্টকোণাকৃতি চারটি টাওয়ার আছে। পূর্ব প্রাচীরে পাঁচটি খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ আছে এবং প্রতিটি প্রবেশ পথ অলঙ্কৃত ফ্রেমের মধ্যে সংস্থাপিত। সম্মুখভাগের অন্যান্য অলঙ্করণের মধ্যে দুই সারিতে বিন্যস্ত প্যানেল-অলঙ্করণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছিদ প্রাচীর এবং কার্নিশ হাল্কাভাবে ঢালু ।এর উপর দশটি অর্ধ গোলাকৃতির গম্বুজ ছাদের শোভাবর্ধন করেছে। গম্বুজগুলো ধসে গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংস্কার সাধন করে সেগুলোর পুনর্নির্মাণ করেছে। জুল্লাহ বা মসজিদ কক্ষটি পাথরের স্তম্ভ দ্বারা উত্তর দিক হতে দক্ষিণে দু'টি লম্বমান আইল বা খিলান সারি এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাঁচটি 'ব্যে' বা হ্রস্ব খিলান পথে বিভক্ত ছিল। তাতে করে এটিতে দশটি বর্গাকৃতি পরিসর সৃষ্টি হয়েছে। এসব গম্বুজ

ছাদ দ্বারা পরিবৃত ছিল। নামাযকক্ষের পশ্চিম প্রাচীরের দক্ষিণপ্রান্তে ছিল তিনটি অলঙ্কৃত মিহরাব, চতুর্থটি ছিল প্যানেল সদৃশ এবং পঞ্চম ক্ষুদ্রাকৃতির মিহরাব দ্বিতলে সংস্থাপিত। দক্ষিণ প্রাচীরে দুটি এবং উত্তর প্রাচীরে দুটি মোট চারটি পার্শ্ববর্তী খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ ছিল। কিন্তু উত্তর প্রাচীরের দুটি খিলানওয়ালা দরজা এখন গ্রেটিং দ্বারা বন্ধ এবং সম্ভবত এটি পরবর্তী সময়ে করা হয়েছে। এই উত্তর প্রাচীরের উত্তর–পশ্চিম কোণে 'যানানা গ্যালারী' বা মহিলাদের নামাযকক্ষ উপর তলায় অবস্থিত ছিল। পশ্চিম প্রাচীরের কেন্দ্রীয় মিহরাবে লতাপাতার অঙ্কন দেখা যায় এবং খাঁচ করা খিলান ফ্রেমে এটি সংস্থাপিত । অলঙ্কৃত ক্ষুদ্রাকৃতির স্তম্ভ এটিকে ধরে রেখেছে। দু'খিলানের মধ্যবর্তী পরিসর লতাগুল্ম ও তরুরাজির প্রতিকৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত। ঝুলন্ত শিকল–ঘন্টা এবং এ জাতীয় অন্যান্য অলঙ্করণ মটিফ এই মসজিদের ডেকোরেশনকে গাম্ভীর্য দান করেছে।[২১] এমনকি মসজিদ গাত্রের কোন কোন অংশে স্থানীয় ফলের মধ্যে পোড়ামাটির ফলকে কাঁঠালের প্রতিকৃতির উপস্থাপন নির্দেশ করে যে, সে সময় এ অঞ্চলে কাঁঠাল উৎপাদনের আধিক্য ছিল এবং শিল্পীগণ তা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন।

কুসুম্বা মসজিদ

মান্দা থানার কুসুম্বায় এই মসজিদ অবস্থিত এবং রাজশাহী শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩০ মাইল। স্বাধীন শুর বংশের গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহের আমলে (শাসনকাল ১৫৫৬–১৫৬০ খৃঃ) সুলায়মান নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক ৯৬৬ হিজরী/১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়।[২২] সুলায়মানের পরিচয় স্পষ্ট নয়। তবে তিনি কোন সরকারী কর্মচারীর মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হবেন বলে ধারণা করা যায়। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে হুসাইন শাহী বংশের পতনের পর থেকে শুরু করে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল তেমনি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উৎকর্ষ সাধিত হয়নি। বরং হুসাইন শাহী আমলের স্থাপত্যরীতি এই সময়ের ইমারতগুলোতে অনুসৃত হয়েছে এবং তা নিম্নমানের পর্যায়ভুক্ত। কুসুম্বা মসজিদ এরূপ স্থাপত্যের একটি উদাহরণ পেশ করে।

এই মসজিদের প্রাচীরের মূল কাঠামো পোড়া ইটের নির্মিত এবং তার বাইরে ও ভিতর উভয় দিক সাইজ করা শিলাখন্ড দ্বারা পরিবৃত। তবে খিলান, গম্বুজ এবং ছাদ এই রীতির বহির্ভূত। পরিকল্পনার দিক থেকে এটি আয়তকার মসজিদ যা উত্তর দিক হতে দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৫৮ ফুট এবং পূর্ব দিক হতে পশ্চিমে প্রস্থে ৪২ ফুট। এটির চার কোণে অষ্টকোণাকৃতি চারটি টাওয়ার আছে। ত্রিগুজ কার্নিশ এবং ইমারতের সন্মুখভাগ অনুভূমিক ব্যান্ড দ্বারা অলঙ্কৃত। নামাযকক্ষের পূর্ব প্রাচীরে বহু খাঁচ বিশিষ্ট খিলানওয়ালা দরজা আছে এবং সেগুলোর সংখ্যা হচ্ছে তিনটি। জুল্লাহ বা নামাযকক্ষের অভ্যন্তর ভাগ পাথরস্তম্ভ দ্বারা উত্তর–দক্ষিণে দু'টি লম্বমান আইল বা খিলান পথ এবং পূর্ব পশ্চিমে তিনটি 'ব্যে' বা হ্রস্ব গলিপথে বিভক্ত হয়ে ছয়টি সম–আকৃতির পরিসর সৃষ্টি করেছে। এসব পরিসর ছয়টি অর্ধ গোলাকৃতি গম্বুজ ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। এই নামাযকক্ষের উত্তর–পশ্চিম কোণে শক্ত পাথর–স্তম্ভের উপর মহিলাদের নামাযের জন্যে 'যানানা গ্যালারী' উপর তলায় সংস্থাপিত। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, উপরে আলোচিত অন্যান্য মসজিদের 'যানানা গ্যালারীতে' বাইরের সিঁড়িওয়ালা প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবশ করতে হয়। কিন্তু এই মসজিদের 'যানানা গ্যালারীতে' দশ ধাপ যুক্ত সিঁড়ি দিয়ে ভিতর থেকে প্রবেশ করা যায়। এই বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যায় যে, দরসবারী এবং ছোট সোনা মসজিদের উপর তলার সংরক্ষিত পরিসর মহিলাদের নামায আদায় করার জন্যে নির্ধারিত এবং সেজন্যে মহিলাদের প্রবেশের জন্যে বাহির দিক থেকে প্রবেশ পথ করা হয়েছে। অপরপক্ষে কুসুম্বা মসজিদের উপর তলার সংরক্ষিত পরিসর রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং সে কারণে তার প্রবেশ পথের ব্যবস্থা মসজিদের ভিতর থেকে করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এটি মহিলাদের নামাযের জন্যে 'যানানা গ্যালারী' না হয়ে রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের নামাযের জন্যে মাকসুরা বা নিরাপত্তাকক্ষ হিসেবে গণ্য করার পক্ষে কোন কোন পন্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। এই মসজিদের পশ্চিম প্রাচীরে তিনটি অলঙ্কৃত মিহরাব আছে। এই মসজিদের সামগ্রিক অলঙ্করণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা যায় যে, পাথরের উপর খোদাই করে লতাপাতা, তরুরাজি, ফুলফল, জ্যামিতিক রেখা এবং বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্করণ মটিফ এই মসজিদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে।

সুলতানী আমলের এসব বিদ্যমান মসজিদ ছাড়া রাজশাহী জেলাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে আরও মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু আজ সেসব আর টিকে নেই। তবে দু'টি মসজিদের কিছু অংশ বিদ্যমান ছিল এবং তা থেকে এখানে সে দু'টি মসজিদের পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা পেশ করব। একটি হলো মাহিসন্তষ মসজিদ এবং অপরটি আচিনঘাট মসজিদ।

মাহিসন্তষ মসজিদ

মাহিসন্তষ একটি ঐতিহাসিক গুপুত্বপূর্ণ স্থান। বৃহত্তর রাজশাহী জেলার ধামুরহাট থানায় এই স্থানটি অবস্থিত। বর্তমানে এটি নওগাঁ জেলার অন্তর্ভুক্ত। গাযী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর লাখনাবতী সাম্রাজ্যের বিজয়ের পর এটি ইকতা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং ইযযউদ্দীন মুহাম্মদ শীরান খলজীকে এর মুকতা বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। দূরদূরান্তর থেকে শিক্ষার্থিগণ এখানে ইল্‌মে দীনের উপর জ্ঞান হাসিলের জন্যে আসতেন। পরবর্তীকালে সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ এখানে একটি টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করে এ স্থানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন। এটি বারবাকাবাদ টাঁকশাল হিসেবে পরিচিত। এখনও এ স্থানের বিরাট অঞ্চল জুড়ে ইট-পাটকেল এবং ধ্বংসস্তূপের যে নিদর্শন বিদ্যমান তা থেকে বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, এই স্থানটি সুলতানী বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাজনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মুঘল সম্রাট আকবর বাংলাকে ১৯টি সরকার বা প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন এবং এই স্থানের গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়ে বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি সরকারের নাম দেন সরকার বারবাকাবাদ। তাই ঐতিহাসিক দিক থেকে ধসে পড়া মাহিসন্তষের এই মসজিদটি আলোচনার জন্যে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

মসজিদটি এখন প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে পশ্চিম দিকের টিকে থাকা মসজিদ প্রাচীরের অংশবিশেষ এবং জুল্লাহ বা নামাযকক্ষের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি পাথরস্তম্ভ থেকে এই মসজিদের একটি সম্ভাব্য ভূমি-নকশা এবং নির্মাণ

পরিকল্পনা তৈরি করা যায়। মসজিদের টিকে থাকা মসজিদ প্রাচীর এবং পাথর স্তম্ভের সূত্র ধরে বলা যায় যে, এই মসজিদ সম্পূর্ণ পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল অথবা মসজিদ প্রাচীরের মূল কাঠামো পোড়া ইট দ্বারা নির্মিত ছিল এবং তার উপর, বাহির ও ভিতর উভয় অংশে সাইজ করা শিলা-খন্ড বিশেষ সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় সংস্থাপিত হয়েছিল। পরিকল্পনার দিক থেকে এটি আয়তাকার মসজিদ যার পরিমাপ আভ্যন্তরীণ পরিসরে উত্তর থেকে দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৬৬ ফুট এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রস্থে ৩৯ ফুট। তবে মসজিদ প্রাচীরের প্রশস্ততা পরিমাপ করে সম্পূর্ণ মসজিদের পরিমাপ দাঁড়ায় দৈর্ঘ্যে ৮০ ফুট এবং প্রস্থে ৫৩ ফুট। জুল্লাহ বা নামাযকক্ষের অভ্যন্তরে পাথর স্তম্ভের অবস্থান বিবেচনা করে বলা যায় যে, এই মসজিদ উত্তর থেকে দক্ষিণে তিন আইল বা লম্বমান তিন খিলান পথ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাঁচ 'ব্যে' বা হ্রস্বমান গলিপথে বিভক্ত ছিল। তাতে করে এই নামাযকক্ষে পনেরটি পরিসর ছিল যার ছাদ অর্ধ গোলাকৃতির পনেরটি ইটের গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। মসজিদের পূর্ব প্রাচীরে পাঁচটি খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ ছিল এবং পশ্চিম প্রাচীরে অনুরূপভাবে পাঁচটি মিহরাব ছিল। পাথরের উপর খোদাই করে বিভিন্ন অলঙ্করণ-মটিফ মসজিদের অলঙ্করণ সাজসজ্জা বাড়িয়ে তুলেছে। উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরে তিনটি করে মোট ছয়টি দরজা ছিল। মোটকথা পরিকল্পনার দিক থেকে একটি জামে মসজিদ হওয়ার সব বৈশিষ্ট্য এই মসজিদের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সন্নিবেশিত হয়েছিল। এই মসজিদের নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে মাহিসন্তষে প্রাপ্ত তিনটি শিলালিপি (দুটি সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহের আমলের এবং একটি সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলের) বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলা যায় যে, উলুঘ ইকরার খান তাঁর অধীনস্ত কর্মচারী আশরাফ খানের মাধ্যমে ১৪৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং তিনি (ইকরার খান) স্বয়ং এই স্থানে ওয়াযির বা মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় ১৪৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলে মসজিদের নির্মাণ ও অলঙ্করণের যাবতীয় কাজ সম্পূর্ণ করেন। কাজেই এই মসজিদকে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই মসজিদকে ইলিয়াস শাহী স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত।

আচিনঘাট মসজিদ

রাজশাহী জেলার বাগমারা থানায় আচিনঘাট অবস্থিত । রাজশাহী শহর থেকে উত্তর দিকে এই স্থানের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় বিশ মাইল। রাজশাহী–নওগাঁ পাকা রাস্তা দিয়ে বাসযোগে মোহনপুর উপজেলা পর্যন্ত ১৫ মাইল যাওয়ার পর একটি কাঁচা রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে পাঁচ মাইল গেলে আচিনঘাট পৌঁছা যায় । আচিনঘাটের এই প্রাচীন মসজিদটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তার প্রাচীরের চিহ্ন সামান্য কিছু লক্ষ্য করা যায়। তবে কিবলা প্রাচীরে তিনটি মিহরাব এবং দু'সারিতে বিদ্যমান সাতটি (এক সারিতে চারটি এবং অপর সারিতে তিনটি) পাথরস্তম্ভ থেকে এই মসজিদের একটি প্রস্তাবিত ভূমি–নকশা ও নির্মাণ পরিকল্পনা পেশ করা যায়।

দুই সারিতে চারটি করে স্তম্ভের অবস্থিতি থেকে ধারণা করা যায় যে, এটি একটি আয়তকার মসজিদ। এসব স্তম্ভের মধ্যবর্তী পরিসর পরিমাপ করে এটির আয়তন সম্পর্কে মত পেশ করা যায়। এই মসজিদের জুল্লাহ বা নামাযকক্ষ উত্তর থেকে দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৫৩ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রস্থ ৩১ ফুট ৬ ইঞ্চি। উত্তর থেকে দক্ষিণে ধাবমান দুই আইল বা লম্বমান খিলানপথ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহমান পাঁচ 'ব্যে' বা হ্রস্বমান গলিপথ দ্বারা এই আয়তাকার পরিসরটি বিভক্ত। ফলে পনেরটি বর্গাকৃতি পরিসরে এটি বিভক্ত এবং এই স্থাপত্য কৌশলে নির্মিত অন্যান্য মসজিদের ন্যায় এটির ছাদ অর্ধ গোলাকৃতি পনেরটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। এই মসজিদের পূর্ব প্রাচীরে পাঁচটি খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরে তিনটি করে ছয়টি অনুরূপ প্রবেশ পথ ছিল। তাহলে সর্বমোট প্রবেশ পথের সংখ্যা দাঁড়ায় এগার। কিবলা প্রাচীরে পাঁচটি মিহরাব ছিল। এখন তিনটি মিহরাব অবশিষ্ট আছে। মিহরাবগুলো খাঁচ করা খিলান ফ্রেমের মধ্যে অবস্থিত। এই মসজিদের উল্লেখযোগ্য কোন অংশ অবশিষ্ট না থাকায় অলঙ্করণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট করে তেমন কিছু বলা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে পোড়ামাটির ফলকে লতাপাতা, তরুরাজি ও শিকল–ঘন্টার প্রতিকৃতি এই মসজিদের বিভিন্ন অংশে উপস্থাপিত হয়েছিল। এই মসজিদটি ছিল ইট নির্মিত এবং ছাদের ভার বহনের জন্যে পাথরস্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছিল। কোন শিলালিপির সন্ধান না পাওয়ার জন্যে এই মসজিদের সঠিক নির্মাণ তারিখ জানা যায় না। তবে ভূমি

নকশা এবং নির্মাণ–শৈলী বিবেচনা করে এই মসজিদকে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী অথবা হুসাইন শাহী (পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দী) আমলের স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে সুলতানী যুগে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে স্থপতি, কারিগর এবং নির্মাণ ও অলঙ্করণ শিল্পীগণ স্থানীয় উপকরণ ও মালমসলা পুঁজি করে যে স্থাপত্য গড়ে তুলেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসা পাওয়ার দাবি করে। সময়ের দূরত্বে ও প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে এবং সর্বোপরি উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে প্রায় অধিকাংশ স্থাপত্য ইমারত ধ্বংস হয়ে গেছে । দু'একটি যা অবশিষ্ট আছে তা আমাদের অতীত ঐতিহ্য এবং গৌরবময় সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। এসবের তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ সরকার এবং জনগণের জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য । এসব মসজিদ সুলতানী যুগে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। জনগণের আবশ্যকীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্যে এসব মসজিদের কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

মুঘল আমলের স্থাপত্যিক নিদর্শন রাজশাহী জেলায় এখন তেমন অবশিষ্ট নেই। মুঘল রাজকীয় স্থাপত্যরীতির কোন ইমারত রাজশাহীতে নেই। বাংলার মুঘল মসজিদ বর্গাকৃতির পরিকল্পনার এক গম্বুজ এবং আয়তাকার পরিকল্পনার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট হয়। রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন ফিরুযপুর মৌজায় অবস্থিত শাহ নিয়ামাতুল্লাহ ওয়ালীর মাকবারা বা সমাধি–সৌধ এবং মসজিদ মুঘল স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে অবশিষ্ট আছে। এ দু'টির আলোচনা থেকে আমরা মুঘল স্থাপত্যের আঞ্চলিক রীতির সাথে কিছুটা পরিচিতি লাভ করতে পারি।

শাহ নিয়ামাতুল্লাহ ওয়ালীর মাকবারা বা সমাধি–সৌধ

বাংলার মুঘল শাসনকর্তা শাহ সুজার (সম্রাট শাহ জাহানের পুত্র) আধ্যাত্মিক মুরশিদ ছিলেন শাহ নিয়ামাতুল্লাহ ওয়ালী। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শাহ নিয়ামাতুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। শাহ সুজা তাঁর মুরশিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁর কবরের উপর এই সৌধটি নির্মাণ করেন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে দুটি বিবরণ পাওয়া যায়। একটি বিবরণের সূত্রে তাঁর মৃত্যু তারিখ

১০৭৫ হিজরী/১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে এবং অপর বিবরণের সূত্রে তাঁর মৃত্যু তারিখ ১০৮১/১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ বলে জানা যায়।

একটি উঁচু স্থানের উপর এই মাকবারা বা সমাধি-সৌধ অবস্থিত। সমাধিকক্ষটি ২১ ফুট ৬ ইঞ্চি বর্গাকৃতির এবং তার চারপাশ বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত। সমাধিকক্ষ এবং বারান্দা সহ ইমারতটির পরিমাপ হচ্ছে ৪৯ ফুট। কাজেই পরিকল্পনার দিক থেকে এটি একটি বর্গাকৃতি স্থাপত্যিক নিদর্শন। বাইরের চার কোণে চারটি অষ্টকোণাকৃতি টাওয়ার আছে এবং তার উপর ফিনিয়াল বা শীর্ষ-চূড়া সহ ছত্রী সংস্থাপিত হয়েছে। বারান্দার পূর্ব প্রাচীরে খিলানওয়ালা তিনটি প্রবেশ পথ আছে। একটি বাল্‌বাকৃতির (কোন্দাকৃতি) গম্বুজ দ্বারা সমাধিকক্ষের ছাদ দেয়া হয়েছে। বারান্দার ছাদ সমতল ভল্ট (খিলানাকৃতি প্রক্রিয়া) দ্বারা আচ্ছাদিত। পশ্চিম দিক ছাড়া সমাধিকক্ষে প্রবেশের জন্যে অপর তিনটি দরজা আছে এবং পশ্চিম প্রাচীরে একটি মিহরাব আছে। ইমারতটি পলেস্তর করা এবং তাতে কোন অলঙ্করণ নেই।

শাহ নিয়ামাতুল্লাহর মসজিদ[২৭]

শাহ নিয়ামাতুল্লাহর সমাধি-সৌধের দক্ষিণে অবস্থিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ শাহ নিয়ামাতুল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তবে স্থানীয় জনগণ এটিকে শাহ সুজার মসজিদ বলে থাকে। পলেস্তর করা খিলানওয়ালা প্রাচীর বেষ্টিত উন্মুক্ত চত্বরের পশ্চিমপাশে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

পরিকল্পনার দিক থেকে এটি একটি আয়তকার মসজিদ এবং এটির পরিমাপ উত্তর থেকে দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৬৩ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রস্থে ২৪ ফুট ৯ ইঞ্চি। চারকোণে চারটি টাওয়ার আছে। অষ্টকোণাকৃতি এসব টাওয়ার ক্রমানয়ে উপরে উঠে গোলাকৃতি ধারণ করেছে এবং প্রতিটিতে ফোকর বিশিষ্ট কিউপোলা বা ছত্রী আছে। জুল্লাহ বা নামাযকক্ষের পূর্ব প্রাচীরে তিনটি খিলানওয়ালা দরজা আছে। পশ্চিম প্রাচীর প্যানেল দ্বারা পরিবৃত। সমস্ত ইমারতটি পলেস্তর করা। এই মসজিদটি এক আইল বিশিষ্ট এবং তিনটি বাল্‌বাকৃতির (কোন্দাকৃতি) গম্বুজ দ্বারা মসজিদের ছাদ আচ্ছাদিত। এসব গম্বুজের চূড়ায় লোটাস

(পদ্ম) ফিনিয়াল শোভা বর্ধন করছে। এই মসজিদের নির্মাণকাল আনুমানিক ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ।

উপরের এ আলোচনা থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, সুলতানী আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহী জেলায় অনেক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং শিল্পকলার দিক থেকে সেগুলোর মান ছিল উন্নত। অপর পক্ষে মুঘল আমলে এ অঞ্চলের উপর তেমন নজর দেয়া হয়নি এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ইমারত এখানে গড়ে উঠেনি। এতদসত্ত্বেও সুলতানী ও মুঘল যুগ মিলে রাজশাহী জেলায় যেসব স্থাপত্যকীর্তি এখনও বিদ্যমান আছে তা মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য এবং উন্নত সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলছে।

রাজশাহী জেলার মুদ্রা ও শিলালিপিঃ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

মুসলমান শাসকগণের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মুদ্রা ও শিলালিপির গুরুত্ব অপরিসীম। সমসাময়িক লিখিত উৎসে এমন তথ্য পাওয়া যায় না, যা মুদ্রা ও শিলালিপির সূত্র থেকে সন্ধান করা যায়। বিশেষ করে মধ্য যুগের মুসলিম ইতিহাস পঠন ও পাঠনের জন্যে মুদ্রা ও শিলাপলিপি মুখ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। উপরন্তু মুদ্রা লেনদেনের প্রয়োজন মিটানোর পর একটি কার্যকরী প্রচার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন এবং খুত্‌বা পাঠ একজন মুসলিম শাসকের বৈধ শাসনের প্রতি ইঙ্গিত করে। মুদ্রায় এমন লিপি উৎকীর্ণ হয়ে থাকে যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আলোকপাত করে অথবা শাসক সম্পর্কে এমন বিশেষণ উপস্থাপিত হয় যার মূল্যায়ন করে ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত ধারার সংযোজন-বিয়োজন কিংবা পুনর্গঠন সম্ভব হয়। শিলালিপির ক্ষেত্রে এসব কথা প্রযোজ্য। বাংলার সুলতানী যুগের ইতিহাস সম্পর্কে মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্যে আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য অবগত হতে পারি। রাজশাহীর অধীভুক্ত অঞ্চলের টাঁকশাল হতে প্রবর্তিত মুদ্রা এবং রাজশাহীর যে কোন স্থানের প্রাপ্ত শিলালিপি রাজশাহী জেলার মুদ্রা ও শিলালিপি হিসেবে গণ্য হয়ে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাংলার সুলতানী আমলের মুদ্রায় বারবাকাবাদ টাঁকশাল নাম উৎকীর্ণ হয়েছে। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ এই টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বারবকাবাদ টাঁকশালকে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মাহিসন্তষের সাথে অভিন্ন মনে করা হয়।[২৮] ৮৭৬ হজরী/১৪৭১ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপির সূত্রে সরকারী পর্যায়ে এই স্থানটি বারবাকাবাদ নামে ব্যবহৃত হওয়ার সমর্থন পাওয়া যায়।[২৯] সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ ব্যতীত সুলতান শামসউদ্দীন মুযাফ্ফর শাহ (১৪৯০–৯৩ খৃঃ) এবং সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ (১৫১৯–১৫৩২ খৃঃ) এই বারবাকাবাদ টাঁকশাল হতে মুদ্রা মুদ্রিত করেছেন। কাজেই এ ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, এই অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই টাঁকশাল হতে প্রয়োজনীয় মুদ্রা মুদ্রিত হয়েছে। বাংলার মুদ্রা তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়ায খলজী মুদ্রায় কালিমা উৎকীর্ণ [৩০] করে মুসলমানদের তাওহীদী বিশ্বাসকে জনগণের নিকট উপস্থাপন করেন। এর পরবর্তী সময়ে সুলতানগণ তাঁদের মুদ্রায় কালিমা উৎকীর্ণ করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ তাঁর মুদ্রায় কালিমা উৎকীর্ণ করার ব্যবস্থা পুনরায় গ্রহণ করেন।[৩১] বারবাকাবাদ টাঁকশাল হতে কালিমা উৎকীর্ণ মুদ্রা মুদ্রিত হয়েছে। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এসব মুদ্রা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে বলে ধারণা করা যায়। সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ তাঁর পিতা সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের অনুসরণে মুদ্রায় خليفة الله بالحجة و البرهان খলীফাতুল্লাহ বিল হুজ্জতি ওয়াল বুরহান, প্রমাণ ও দলীল সহকরে 'আল্লাহ্র খলীফা' লিপি উৎকীর্ণ করেন।[৩২]

এই 'খলীফাতুল্লাহ' লিপি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলাম একটি অবিভাজ্য ঐশী জীবন–বিধান। এই জীবন–বিধনের বাস্তব প্রয়োগের অপর নাম শরীয়ত। ইসলামী শরীয়তের মাপকাঠিতে খিলাফত একটি অবিভাজ্য আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রতিষ্ঠান। খিলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। শরীয়তের সংজ্ঞায় মহানবী (সা) আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধি। খুলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের পরবর্তী উমাইয়া ও

আব্বাসীয় বংশের বৈধ খলীফা বা শাসকগণ রাসূলের খলীফা বা প্রতিনিধি। উপরন্তু বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে স্বাধীন এবং অর্ধ স্বাধীন সুলতানগণ পরোক্ষভাবে মুসলিম জাহানের খলীফার খলীফা বা প্রতিনিধি। কিন্তু বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তৎকালীন সুলতানগণ জনগণের আনুগত্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের মুদ্রায় 'খলীফা' অর্থজ্ঞাপক শব্দ উৎকীর্ণ করেছেন। বাংলার সুলতানগণ এ থেকে পশ্চাতে পড়ে থাকেননি। সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ এবং তাঁর ন্যায় অন্যান্য সুলতানের খলীফাতুল্লাহ বিল হুজ্জাতি ওয়াল বুরহান' উপাধি গ্রহণ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এসব সুলতান নিজেদেরকে আল্লাহ্র খলীফা হিসেবে ঘোষণা করার পিছনে বাংলার উলামার সমর্থন ছিল বলে অনুমান করা যায়। কারণ আব্বাসীয় খিলাফতের পর মুসলিম বিশ্বে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর মীমাংসার জন্যে বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক উলামা এগিয়ে আসেন এবং স্ব–স্ব দেশের মুসলিম শাসককে খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের আইনগত সমাধান দান করেন। উপরন্তু তাঁরা শাসকদের 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধি গ্রহণ বৈধ বলে বিবেচনা করেন। বাংলার উলামা এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং তাঁদের এই উদ্যোগে নিঃসন্দেহে ন্যায্যদাহ। কারণ বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ এবং তার ন্যায় অন্যান্য সুলতানের এই উপাধি গ্রহণ মোটেই অযোক্তিক হয়নি। টাঁকশাল শহর বারবাকাবাদ তাই বাংলার মুসলিম শাসনের অতীত গৌরবগাঁথা দিনের কথা আমাদের স্মৃতিতে উজ্জীবিত করে তোলে। মুদ্রার পঠন–পাঠন বাংলার ইতিহাসের আরও অনেক না জানা ধারা আমাদের সামনে উপস্থাপন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব শিলালিপি সংগৃহীত হয়েছে সেগুলো সাধারণত মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য আমাদের নিকট পেশ করে। পাথরের উপর অতি মনোরমভাবে বিভিন্ন আরবী লিখন পদ্ধতিতে খোদাই কর্মে সে সময়ের শিল্পীদের যোগ্যতা আমাদের নিকট পরিস্ফুট হয়ে উঠে। উপরন্তু মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এসব শিল্পের উৎকর্ষ সাধনকে গতিময় করে রেখেছিল। এসব শিলালিপির বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মুসলিম

জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এ গুলোর আবেদন মোটেই গৌণ নয়। উপরন্তু শিলালিপির বিষয়বস্তু থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলার মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাসের পুনর্গঠন সম্ভব। শিলালিপির এই গুরুত্ব সামনে রেখে রাজশাহীর মনোনীত কয়েকটি শিলালিপির পাঠ অনুবাদ ও ঐতিহসিক গুরুত্বসহ আলোচনা করার প্রয়াস পাব। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, এসব শিলালিপির ভাষা আরবী, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দু'একটি ফারসী শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

ওয়াযির বেড়াভাঙ্গা শিলালিপি ৩৩

রাজশাহী জেলার নাচোল থানার অন্তর্গত ওয়াযির বেলডাংগা গ্রাম থেকে শিলালিপিটি সংগৃহীত হয়েছে এবং তা এখন বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের এই শিলালিপি একটি পবিত্র ইমারতের নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্যের উপর আলোকপাত করে। এই শিলালিপিটি আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ হয়েছে এবং আরবী বর্ণমালার পৃথকীকরণ চিহ্ন নুকতা ব্যবহার না করে অনুপমভাবে শব্দের বিন্যাস করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের নুকতা বিহীন কুফী লিখন-পদ্ধতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলার শিলালিপিতে লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, মুসলিম শাসনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে শাসকগণ লিখন-শিল্পীদেরকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। একটি মসৃণ শিলা গাত্রে লিপিটি দুই অংশে চার সারিতে উৎকীর্ণ হয়েছে। লিপির পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ ঃ

প্রথম অংশ

১ম সারি-

بسم الله الرحمن الرحيم - لا الـه الا انله محمد رسول
الله - هذا مال الكبير الكريم المويد المظفر المرصود
المجاهد المرتبط الغازى

২য় সারি-

مصرف الدولة و الدين اسل الاسلام و المسلمين ابو
الملوك و السا طين المعروف

দ্বিতীয় অংশ ঃ

১ম সারি-

بدينار حب السلطاى لظافر الله اقباله فى عهد يوم
السلطان الاعـم غياث الدنيا و الدين ابو المظفر بهادر
شاه بن السلدان اصمد الله قوامين مملكته و مهد براهين

২য় সারি-

سلطنته شهو سنة اثنى و عشرين و سبعماية بناء
صفقا لوجه الله تعالى لقبل الله منه بخط العبد
الضعيف محمد بن محمد بن احمد غفر الله احمعين -

অনুবাদ ঃ ১ম অংশ

১ম সারি-আল্লাহ্, করুণাময় ও দাতা এর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ তাঁর রসূল।

এই ধনরাশি এমন একজন মালিক বা অমাত্যের যিনি মহান, দাতা, করুণাসিক্ত, বিজয়ী, নিরাপত্তা প্রাপ্ত, যোদ্ধা, গাযী

২য় সারি–পার্থিব সম্পদ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সংরক্ষক, ইসলাম ও মুসলমানগণের শক্তি, সম্রাট ও শাসকগণের পূর্বসূরি যিনি পরিচিত

অনুবাদ ঃ ২য় অংশ

১ম সারি–দীনার হিসেবে এবং সুলতানের মনোনীত । আল্লাহ্ মহান সুলতান গিয়াস উদ্দীন আবুল মুযাফ্ফর বাহাদুর শাহ (সুলতানের পুত্র) এর শাসনকালে তাঁর আগমনকে সাফল্য দান করুন । আল্লাহ্ এই সুলতানের সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা সুসংহত করুন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করুন

২য় সারি–তাঁর সালতানাতের পরিধিকে । ৭২২ হিজরীর /১৩২২ খৃঃ কোন এক মাসে মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্য এই পবিত্র ইমারতটি নির্মিত হয়। আল্লাহ্ তা অবশ্যই কবূল করবেন। এই লিপিটি তাঁর একজন অযোগ্য দাস মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়েছে । আল্লাহ্ সকলকে ক্ষমা করুন।

এই শিলালিপিতে উল্লেখিত পবিত্র ইমারত বলতে মসজিদ অথবা মাদ্রাসা নির্মাণকে নির্দেশ করা হয়েছে। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে তুর্কী মুসলমানগণ কর্তৃক এই দেশ বিজয়ের পর একটি মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন ও বিকাশের জন্যে মসজিদ ও মাদ্রাসার ভূমিকা অতি ব্যাপক । সে সময়ের মুসলমান শাসকগণ এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁরা এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন । আরবী মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা হওয়ার কারণে তার উৎকর্ষ সাধনের দিকে বাংলার মুসলমান শাসকগণ প্রভূত দৃষ্টি দিয়েছেন। রাজশাহী জেলার এই শিলালিপি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ । এই শিলালিপির শব্দ চয়ন ও বাক্যবিন্যাস অতি চমৎকার এবং লিখন–শৈলী অতি মনোরম ।

সুলতানগঞ্জ শিলালিপি ৩৪

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানাধীন সুলতানগঞ্জ স্থানটি রাজশাহী শহর থেকে পশ্চিম দিকে বিশ মাইল দূরত্বে রাজশাহী নওয়াবগঞ্জ পাকা রাস্তার পশ্চিম ধারে

অবস্থিত । এই স্থানকে জাহানাবাদ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। সুলতানী আমলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট ছিল বলে ধারণা করা হয় । সুলতান জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের আমলের ৮৩৫ হিজরী/১৪৩২ খৃষ্টাব্দের এই শিলালিপি একটি মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করে । এই শিলালিপির পাঠ নিম্নে দেয়া হলো । প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষার উৎকীর্ণ এই শিলালিপিতে ব্যাকরণগত ও শাব্দিক কিছু ভুল আছে। সম্ভবত ভাষাবিদের অভাবে অথবা উৎকীর্ণ শিল্পীর অজ্ঞতার কারণে এসব ভুল সংঘটিত হয়েছে। শিলাটির উপরিভাগে এক সারি এবং মুখ্য অংশে তিন সারিতে সম্পূর্ণ লিপিটি উৎকীর্ণ হয়েছে।

উপর অংশে ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - الله خير حافظا و هو ارحم
الرحمين - قال النبى صلى الله عليه و سلم من بناء
المسجد فى الدنيا بناء الله اربعين قصرا فى جنة -

মুখ্য অংশ ঃ

১ম সারি–

قال الله تعالى و اقيموا الصلواة طرف النهار و زلفا من
الليل - ان الحسنات يذهبن السيئات - ذلك ذكرى
للذاكرين و اصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين

২য় সারি–

قال النبى صلى الله عليه و سلم خير البقاع مساجدها
شر البقاع اسواقها و قال عم من انفق درهما على طالب
العلم فكانما انفق جبلا من ذهب الا حمر فى سبيل الله
تعالى -

৩য় সারি–

بنی هذا المسجد و تم فی زمان امیر جلال الدنیا و الدین

ابو المظفر محمد شاه سلطان خلد ملکه و البانی لهذه

الخیرة ملك صدر الملة و الدین سلطانی امیر ده سوتیه

خاص طال عمره و ابتدئها فی الاحد لخامس من جماد الاول

سنة خمس و ثلثین و ثمنمایة –

অনুবাদ ঃ উপর অংশ–আল্লাহ্, দয়ালু ও দাতার এর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট রক্ষাকর্তা ও নিরাপত্তা দানকারী এবং করুণা প্রদর্শনকারীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র অফুরন্ত করুণা দানকারী। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্ তার জন্যে বেহেশতে চল্লিশটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন ।

মুখ্য অংশ ঃ

১ম সারি–দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রারম্ভিক সময়ে তুমি নামাযকে প্রতিষ্ঠিত কর । অবশ্যই সৎ কাজ মন্দ কাজকে অপসারিত করে । উপদেশ গ্রহণকারীর জন্যে এই উপদেশ এবং ধৈর্য ধারণ কর, অবশ্যই আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের পারিশ্রমিক নষ্ট করে দেন না ।

২য় সারি–মহানবী (সা) বলেছেন ঃ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান বাজারসমূহ। এবং মহানবী (সা) আরও বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য এক দিরহাম খরচ করে সে যেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় লাল স্বর্ণের একটি পাহাড় ব্যয় করে।

৩য় সারি– এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু এবং শেষ হয়েছিল আমীর জালাল উদ্দীন আবুল মুযাফ্‌ফর মুহাম্মদ শাহ সুলতানের আমলে তাঁর সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হোক। এই মহৎ কাজের নির্মাণকারী ছিলেন সুলতানের বিশেষ প্রিয়ভাজন, দশ জন পানি সরবরাহকারীর নেতা মালিক সদরুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন। তাঁর আয়ু বৃদ্ধি হোক। তিনি এই ইমারতের নির্মাণ কাজ

৮৩৫ হিজরীর/১৪৩২ খৃষ্টাব্দ জমাদিল আওয়াল মাসে ৫ তারিখ রবিবারে শুরু করেছিলেন।

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ঃ এই শিলালিপিতে কিছু তাথ্যগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। উপরি অংশে উৎকীর্ণ সারিতে বেশ কয়েকটি ভুল আছে। বিসমিল্লাহ এর পর الله শব্দে হবে فالله এরপর মহানবী (সা)–এর হাদীসে শব্দ ব্যবহার অশুদ্ধভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। শুদ্ধভাবে উৎকীর্ণ হলে হবে ঃ

من بنى مسجد فى الدنيا بنى الله له سبعين قصرا فى الجنة

সাধারণভাবে মহানবী (সা)–এর হাদীসে সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চল্লিশটি প্রাসাদ নির্মাণের কথা কোন স্থানে উল্লেখিত হয়নি। উৎকীর্ণ শিল্পী ভুলক্রমে سبعين এর স্থলে اربعين শব্দ উৎকীর্ণ করেছেন। অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াতেও কয়েকটি শব্দের রূপান্তর ভুল করে উপস্থাপনা করা হয়েছে। اقيموا الصلواة طرف النهار –এর স্থলে শুদ্ধ আয়াত অংশ হবে اقم الصلواة طرفى النهار । উৎকীর্ণ শিল্পী অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে আরবী রিকা লিখন–পদ্ধতিতে লিপিটি শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ করেছেন। এই লিপিতে কুরআনের যে আয়াত এবং মহানবী (সা)–এর যে হাদীস দুটি উল্লেখ করা হয়েছে তার বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে, একটি মসজিদ এবং তার সাথে ইল্‌ম শরীয়তের উপর শিক্ষাদানের জন্যে একটি মাদ্রাসা সুলতান জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের একজন প্রিয়ভাজন অমাত্য কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু শিলালিপিটি কোন একটি নির্দিষ্ট ইমারত–গাত্রে সংযুক্ত অবস্থায় না পাওয়ার জন্যে মসজিদ ও মাদ্রাসার স্থান সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা যায় না। তবে সুলতানগঞ্জের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলা যেতে পারে যে, সুলতানী যুগের এই প্রশাসনিক ইউনিটের যে কোন একটি স্থানে শিলালিপিতে উল্লেখিত মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, সুলতান জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান। তিনি ছিলেন রাজা গণেশের পুত্র। রাজা গণেশ ইলিয়াশ শাহী বংশের সুলতানদের আমলে একজন বিখ্যাত মালিক ও অমাত্য ছিলেন। কিন্তু

তাঁর উপর মুসলমান সুলতানদের অতি বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং কয়েকজন সুলতানকে হত্যার শিকার করে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করেন। এ দেশ থেকে মুসলমানদেরকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু সুবিধাভোগী ও স্বার্থান্বেষী মুসলমানের সমর্থনলাভ করে বুনিয়াদী মুসলমান এবং উলামা সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার শুরু করেন। কিছু বিখ্যাত আলিমকে তিনি হত্যাও করেন।[৩৫] হিন্দুদের পূর্ণ সমর্থন পেয়ে এবং সুবিধাভোগী একাংশ মুসলমানকে নিয়ে তিনি মুসলমান উৎখাতের অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত হন। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। সে যুগের প্রসিদ্ধ আলিম ও সূফী–সাধক পান্ডুয়ার নূর কুতুবুল আলম এই উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানের উলামা এবং জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কীকে গণেশের এই অশুভ পরিকল্পনা অবহিত করিয়ে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের সংরক্ষণে তাঁদের সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ সাহায্য কামনা করেন।[৩৬] জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কী সে স্থানের বিখ্যাত আলিম ও সূফী আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর সুপারিশক্রমে রাজা গণেশকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য বাংলার দ্বার প্রান্তে এসে পৌছেন। এই সংবাদ পেয়ে রাজা গণেশ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের প্রাণ রক্ষার দায়ে হযরত নূর কুতুবুল আলমের পদপ্রান্তে উপনীত হন এবং তাঁর বার বছরের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুলতান ইব্রাহীম শর্কীর লৌহ কঠোর হাতের পাঞ্জা থেকে রেহাই পান। ইব্রাহীম শর্কী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত নূর কুতুবুল আলমের হাতে গণেশের পুত্র যদু বা জিতমল ইসলাম গ্রহণ করে জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নাম লাভ করেন। এই জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ বাংলার সুলতান হন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারকল্পে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের অনুকরণে মক্কা মুয়াযযমায় মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন।[৩৭] তিনি হানাফী মত গ্রহণ করেন। তিনি পুরাতন মসজিদের সংস্কার করেন, অনেক নতুন মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি তাঁর মুদ্রায় মুসলমান ধর্মবিশ্বাস কালিমা উৎকীর্ণ করেন। আলোচ্য এই শিলালিপিতে তাঁর আমীর উপাধি গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় । শরীয়তের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাঁর

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে অনুমান করা যায় । তিনি নিজেকে মুদ্রায় খলীফাতুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে উপস্থাপন করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় খিলাফতের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করার প্রয়াস পান । ১৪১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শাসন কার্য পরিচালনা করেন । তাঁর শাসনামলে জনগণের সুখ ও শান্তি নিশ্চিত হয়েছিল । সবশেষে আলোচ্য শিলালিপির সূত্রে বলা যায় যে, সুলতান জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ মুসলিম সমাজের ক্রমোন্নয়ন ও বিকাশের জন্যে রাজধানী শহর ছাড়াও দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ।

আলোচ্য শিলালিপিতে জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্যে এক দিরহাম ব্যয় করাকে এক স্বর্ণের পাহাড় দান করার সাথে তুলনা করে জ্ঞান অর্জনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট করে বলা যায় যে, মাদ্রাসা নির্মাণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়াও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যে আবেদন রাখা হয়েছে যাতে করে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অর্থানুকুল্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিক্ষার্থীদের জন্যে মাদ্রাসা গড়ে উঠতে পারে ।

মাহিসন্তষ শিলালিপি [৩৮]

মাহিসন্তষের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এই স্থান হতে তিনটি শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে । তার মধ্যে দু'টি রুকনউদ্দীন বারবক শাহের আমলের এবং একটি আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলের । তিনটি শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ে মাহিসন্তষের মসজিদ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, উল্লেখিত মসজিদটি সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহের আমলে উলুঘ ইক্‌রার খান আশরাফ খানের মাধ্যমে নির্মাণ করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে সেই শিলালিপি পাঠসহ নিম্নে আলোচিত হলো। মসৃণ পাথরে দুই লাইনে লিপি উৎকীর্ণ হয়েছে।

قال النبى صلى الله عليه و سلم من بنى المسجد فى

الدنيا بنى الله سبعين قصرا فى الجنة - بنى المسجد فى

زمن الملك العادل السلطان ابن السلطان ركن الدنيا و
الدين ابو المجاهد بار بكشاه السلطان ابن محمود شاه
السلطان - البانى خان المعظم الغ اقرار خان بواسطى
خان معظم اشرفخان - خمس ستين و ثمانماية -

অনুবাদ ঃ মহনবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মসজিদ নির্মাণ করেন আল্লাহ্ বেহেশতে সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদ সুবিচারক শাসক সুলতানের পুত্র সুলতান রুকনউদ্দীন আবুল মুজাহিদ বারবক শাহ আস-সুলতান বিন মাহমুদ শাহ আস-সুলতানের সময়কালে নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদের নির্মাণকারী হচ্ছেন সম্মানিত খান উলুঘ ইক্‌রার খান। তিনি সম্মানিত খান আশরাফ খানের মাধ্যমে ৮৬৫ হিজরী/১৪৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন।

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ঃ আরবী নাস্‌খ লিখন-পদ্ধতিতে লিপিটি উৎকীর্ণ হয়েছে। শব্দ ও ভাষাগত তেমন কোন ত্রুটি এতে পরিলক্ষিত হয় না। তবে لسجد এর স্থলে শুদ্ধ শাব্দিক ব্যবহার হবে مسجد। এই শিলালিপির সাক্ষ্যে বলা যেতে পারে যে, মাহিসন্তষের অবলুপ্ত প্রায় সমজিদটি সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহের আমলে নির্মিত হয়েছিল। উলুঘ ইক্‌রার খানের নির্দশে আশরাফ খান মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। উলুঘ তুর্কী শব্দ এবং তা একজন সামরিক ও প্রশাসনিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বুঝায়। উলুঘ ইক্‌রার খান সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহের আমলে মাহিসন্তষ সহ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাজনের সেনাধ্যক্ষ এবং ওয়াযির ছিলেন। বর্তমান রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে এই প্রশাসনিক ইউনিটটি গঠিত ছিল বলে অনুমিত হয়। আলোচ্য শিলালিপির সুত্রে বলা যায় যে, উলুঘ ইক্‌রার খানের অধিনস্ত কর্মচারী ছিলেন আশরাফ খান, এবং তাঁকে মাহিসন্তষে প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এই শিলালিপিতে সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহকে একজন সুবিচারক শাসক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শিলালিপির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে,

মুসলিম সমাজ গঠনের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে মসজিদ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান এবং তার উপরই গুরুত্ব আরোপ করে বাংলার সুলতানগণ বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন।

সুলতানগঞ্জ শিলালিপি ৩৯

সুলতানগঞ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই স্থানের জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের আমলের একটি শিলালিপি ঐতিহাসিক তাৎপর্য সহ আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য শিলালিপি পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলে উৎকীর্ণ হয়েছে। এই শিলালিপিতেও একটি মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু শিলালিপিটি ইমারত গাত্রে সংযুক্ত না থাকায় লিপিতে উল্লেখিত মসজিদ সম্পর্কে কোন তথ্য অবগত হওয়ার সুযোগ নেই। অনুভূমিক বান্ড দ্বারা লিপিটি দুই লাইনে বিভক্ত। তাছাড়া লিপিটির দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে কিছু উৎকীর্ণ অংশ আছে। নিচে লিপির মূল ভাষ্য দেয়া হলো ঃ

قال النبى عليه السلام من بنى مسجدا بنى الله تعالى
سبعين قصرا فى الجنة - بنى هذا المسجد فى عهد
السلطان ابن السلطان نبن السلطان شمس الدنيا و الدين
ابو المظفر يوسف شاه ابن بار بكشاه سلطانبن محمود
شاه سلطان بنا كرده خانمعظم و خاقان اعظم الغ
صوفيخان بتاريخ تسع و سبعين و ثمانماية -

দক্ষিণ পার্শ্ব ঃ

و يسبح الرعد بحمده و الملئكة من خيفته

বাম পার্শ্ব ঃ لا اله الا الله محمد رسول الله

অনুবাদ ঃ মহনবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্ বেহেশতে সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি সুলতান তাঁর পুত্র সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ সুলতান বিন বারবক শাহ সুলতান বিন মাহমুদ শাহ সুলতান এর আমলে নির্মিত হয়েছিল। এটি সম্মানিত খান ও মহান খাকান উলুঘ সূফী খান ৮৭৯ হিজরী/১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন।

দক্ষিণ পার্শ্ব ঃ এবং বিদ্যুৎ-গর্জন তাঁর (আল্লাহ) প্রশংসা করে থাকে এবং ফেরেশতাও তাঁর ভয়ে প্রশংসায় লিপ্ত থাকে।

বাম পার্শ্ব ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল।

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ঃ লিপিটি আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ। তবে দুটি পারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে کرده বنا এবং تاريخ লিপিতে উপস্থাপিত অক্ষরসমূহের অনুভূমিক বক্র রেখা এবং লম্ব দন্ডের অনুপাতিক পরিমাপ বিবেচনা করে এটিকে আরবী মুহাক্কাক লিখন-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অলঙ্করণ প্রক্রিয়ার দিক থেকে এটিকে তীর-ধনুক তুগরার বৈশিষ্ট্য সহ সাঁতার-রত হাঁস শ্রেণীভুক্ত তুগরা হিসেবে অভিহিত করা যায়। এই লিপিতে পিতামহ পর্যন্ত সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের বংশ পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম পর্যায়ের ধারাবাহিক উত্তরাধিকার শাসনের প্রতি দিক নির্দেশ করে। উপরন্তু সুলতানগঞ্জ প্রশাসনিক বিভাজনে সুলতান শামসউদ্দীনের মনোনীত সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে উলুঘ সূফী খানের নাম পাওয়া যায়। সম্মানিত খান এবং মহান খাকান জাতীয় বিশেষণ কেবলমাত্র উর্দ্ধতন সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব দিক বিচার করে সুলতানগঞ্জের এই লিপিটির তাৎপর্য মোটেই গৌণ নয়।

দরসবারী শিলালিপি[৪০]

দরসবারী মসজিদ এবং এ স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই শিলালিপিটি দরসবারী মসজিদের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তা বর্তমানে কলিকাতা মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে সংরক্ষিত আছে। শিলাটি অতি

বৃহৎ আকারের এবং তা দরসবারী মসজিদের গাত্রে সংযুক্ত ছিল বলে ধরে নেয়া হয়। শিলালিপিটি আরবী ভাষায় নস্খ লিখন-পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ। উৎকীর্ণ শিল্পী অতি মনোরমভাবে এবং তুগরা আলঙ্কারিক লিখন-শৈলীতে লিপি উৎকীর্ণ করেছেন। উর্ধ্বগমন পদ্ধতিতে লিপিটিকে শিলা গাত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

লিপির পাঠ ও অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

قال الله تعالى و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و

قال النبى صلى الله عليه و سلم من بنى مسجدا لله بنى

الله له قصرا فى الجنة مثله - قد بنى هذا المسجد

الجامع السلطان الاعدل الاعظم مالك الرقاب و الامم

السلطان بن السلطان ابن السلطان شمس الدنيا و الدين

ابو المظفر يوسف شاه السلطان ابن باربكشاه السلطان

ابن محمود شاه السلطان خلد الله ملكه و سلطنته و

افاض على العلمين احسانه و بره فى اربع و ثمانين و

ثمانماية هجرية -

অনুবাদ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ এবং অবশ্যই মসজিদসমূহ আল্লাহ্র। সুতরাং আল্লাহ্র সাথে কাকেও অংশীদার করো না। এবং মহানবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্ তার জন্যে বেহেশতে অনুরূপ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই জামে মসজিদ একজন সুবিচারক, মহান সুলতান এবং দেশ ও জাতিসমূহের শাসক নির্মাণ করেছেন। এই সুলতানের পিতামহ ও পিতা উভয়ে সুলতান ছিলেন। এই সুলতান হলেন শামসউদ্দীন আবুল মুযাফ্ফর ইউসুফ শাহ বিন বারবক শাহ আস-সুলতান বিন মাহমুদ শাহ আস সুলতান। আল্লাহ্ তাঁর সাম্রাজ্য ও সালতানাত দীর্ঘস্থায়ী করুন এবং পৃথিবীতে তাঁর দান ও কল্যাণ সম্প্রসারিত করুন। এই মসজিদটি ৮৮৪ হিজরীতে (১৪৭৯ খৃঃ) নির্মিত হয়েছিল।

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন : এই শিলালিপিতে উল্লেখিত মসজিদকে জামে মসজিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সুলতান তাঁর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে তা নির্মাণ করেছিলেন বলে লিপিতে ব্যবহৃত ভাষা হতে জানা যায়। সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ একজন সুবিচারক ও সুদক্ষ সুলতান ছিলেন। এই শিলালিপির সূত্রে তা অবগত হওয়া যায়। এই শিলালিপির সূত্রে আরও ধারণা করা যায় যে, দেশ ও বিদেশে সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। এই শিলালিপির প্রমাণে আমরা বলতে পরি যে, সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত দরসবারী মসজিদ একটি জামে মসজিদ ছিল। মসজিদের পরিকল্পনাও তা সমর্থন করে। পূর্বে মসজিদ পরিকল্পনা আলোচিত হয়েছে।

দরসবারীর দুটি মাদ্রাসা শিলালিপি ৪১

দরসবারীর আশপাশের ধ্বংসস্তূপ হতে সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলে মাদ্রাসা নির্মাণ সম্পর্কিত দু'টি শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। শিলালিপিতে উল্লেখিত মাদ্রাসার স্থান সনাক্তকরণ সহজসাধ্য নয়। তবে দরসবারী মসজিদের পূর্বপাশে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে একটি প্রকান্ড মাদ্রাসা কমপ্লেক্স হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা নির্মাণ সম্পর্কিত দু'টি শিলালিপির তারিখ যথাক্রমে ৯০৭ এবং ৯০৯ হিজরী । ৯০৯ হিজরীর শিলালিপি মাদ্রাসা কমপ্লেক্সের ধ্বংসস্তূপ হতে পাওয়া গিয়েছে এবং সে কারণে ৯০৯ হিজরীর শিলালিপি দরসবারী মাদ্রাসার শিলালিপি হিসেবে অভিহিত হতে পারে । সেক্ষেত্রে ৯০৭ হিজরীর শিলালিপি এই অঞ্চলের অপর কোন মাদ্রাসার শিলালিপি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । শিলালিপি দুটির পাঠ, অনুবাদ ও পর্যালোচনা নিচে দেয়া হলো।

এক নম্বর শিলালিপি :

قال النبي صلى الله عليه و سلم – اطلبوا العلم و لو
بالصين – امير ببناء هذه المدرسة الشريفة السلطان
الاعظم الاكرم سيد السادات منبع السعادات المجاهد فى
سبيل الله المنان الفاتح للكامرو و الكامته بعون الرحمن

علاء الدنيا و الدين ابو المظفر حسين شاه السلطان
الحسيني خلد الله ملكه و لتدريس علوم الدين و تعليم
احكام اليقين راجيا من الله الامر العظيم و سائلا منه
رضوانه القديم – فى غرة شهر رمضان سنة سبع و
تسعماية –

অনুবাদ : মহানবী (সা) বলেছেন : জ্ঞান অন্বেষণ কর যদিও তা চীন দেশে গিয়ে করতে হয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারী, করুণাময়ের সাহায্যে কামরূপ ও কামতা বিজয়ী, মহান সুলতান, সাইয়েদগণের সাইয়েদ এবং শুভ কাজের উদ্যোগী আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ আস- সুলতান যিনি হযরত হুসাইনের বংশধরের অন্তর্ভুক্ত এই মর্যাদা সম্পন্ন মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তন নির্মাণের আদেশ প্রদান করেছেন। দীন বা ইসলামী জীবন বিধানের যাবতীয় বিদ্যা এবং ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত সব বিষয়ের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদানের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আল্লাহ্‌র নিকট হতে কাঙ্খিত পুরস্কার লাভ ও তাঁর সন্তুষ্ট হাসিলের বাসনা নিয়ে ৯০৭ হিজরীর রমযান মাসের প্রথম দিকে এই মাদ্রাসাটি নির্মিত হয়েছে।

দুই নম্বর শিলালিপি :

الحمد لله الذى اعطى لمن اوى العلماء حظا جسيما و فضل
من أحسن اليهم فضلا عظيما و عظمهم تعظيما و كرم من
نصرهم تكريما و الصلواة على رسوله الذى قال من اوى
عالما اواه الله يوم القيامة و اله و اصحابه الذين فازوا
بهذه الدرجة الدليمة و بعد فان السلطان المنصور
بنصره السبحاني علاء الدنيا و الدين ابو المظفر حسين

شاة السلطان بن سيد اشرف الحسينى ادامه الله فى هذه
المملكة مع الا ولاد و الحفدة الى يوم القيامة – بنى هذه
المدرسة اللطيفة الجميلة فى سنة تسع و تسعماية –

অনুবাদ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের আশ্রয়দাতাকে সৌভাগ্য দান করেন, তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীলকে অনুগৃহীত করেন, তাঁদের সম্মানকারীকে সম্মান দান করেন এবং তাঁদের সাহায্যকারীকে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর (আল্লাহ্‌) রসূলের প্রতি অশেষ রহমত হোক যিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে (প্রকৃত আলিম অর্থে) আশ্রয়দান করেন আল্লাহ্‌ তাকে কিয়ামতের দিন আশ্রয় দান করবেন এবং তার সহচর ও বংশধর এই নিরাপদ মর্যাদা লাভ করবে। অতঃপর ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত এই বিজয়ী সুলতান আলাউদ্দীন আবুল মুযাফ্‌ফর হুসাইন শাহ বিন সাইয়েদ আশরাফ আল–হুসাইনকে আল্লাহ্‌ সন্তানসন্ততি ও বংশধর সহ এই সাম্রাজ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করুন। তিনি এই বৃহৎ ও মনোরম মাদ্রাসা ৯০৯ হিজরী সনে নির্মাণ করেন।

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ঃ শিলালিপি দুটি সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলের এবং দুটি শিলালিপিতে মাদ্রাসা নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে মাদ্রাসা দুটি নির্মিত হয়েছে। প্রথম মাদ্রাসাটি নির্মিত হয়েছে ৯০৭ হিজরীর রমযান মাসের প্রথম দিকে (১৫০২ খৃঃ), অপরটি ৯০৯ হিজরী/১৫০৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে। মাদ্রাসা দুটির মধ্যে ৯০৯ হিজরীর (১৫০৩ খৃঃ) মাদ্রাসাকে দরসবারী স্থানের ধ্বংসপ্রাপ্ত মাদ্রাসা ইমারতের সাথে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু ৯০৭ হিজরীর শিলালিপির উল্লেখিত মাদ্রাসার কোন নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করা যায় না। এই দু'টি শিলালিপির সূত্রে বলা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজশাহী জেলায় আলাউদ্দীন হুসাইন শহের দু'টি মাদ্রাসা জনগনের মধ্যে শিক্ষার আলো

ছড়িয়ে দিতে এবং ইসলামে দীনের প্রসার ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

৯০৭ হিজরীর শিলালিপিকে আমরা আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের বিজয় স্মারকলিপি হিসেবে গণ্য করতে পারি। একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তাঁর কামরূপ ও কামতা বিজয় উদ্‌যাপন করেছেন এবং আল্লাহ্‌র শুকরীয়া আদায় করেছেন। উপরন্তু ৯০৭ হিজরী/১৫০২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি কামরূপ ও কামতা জয় করেছিলেন তা এই উৎকীর্ণ লিপি থেকে প্রমাণ করা যায়। জ্ঞান অর্জনের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ মহানবী (সা)–এর একটি হাদীস এই উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্‌ দীনের হিফাযত এবং মানব কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনবোধে দূর দেশে গিয়ে জ্ঞানানুশীলনের তাকীদ করা হয়েছে। এই শিলালিপিতে মাদ্রাসার মুখ্য পাঠ্যসূচীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো ধর্ম বিশ্বাসের জন্যে আকাইদ ও কালাইম বিষয়ক আলোচনা এবং দীনের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্যে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ এবং অন্যান্য ব্যবহারিক শাস্ত্র।

৯০৯ হিজরীর শিলালিপিতে যে মাদ্রাসার উল্লেখ আছে তাতে ধর্মীয় ও লৌকিক সকল বিষয় পাঠসূচী ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ উৎকীর্ণ লিপিতে মাদ্রাসার যে দু'টি বিশেষণ اللطيفة ও جميلة (বৃহৎ ও মনোরম) ব্যবহৃত হয়েছে তা একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায়তনকে বুঝানোর জন্যে করা হয়েছে। এই শিলালিপিতে আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা)–এর একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। একটি সমাজের সুগঠন ও পরিশীলিত করার পিছনে উলামা সম্প্রদায়ের অবদান থাকে খুব বেশি। এই শিলালিপির সূত্রে বলা যায় যে,আলিম, পন্ডিত ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে স্ব–স্ব পরিমন্ডলে কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন।

ছোট সোনা মসজিদের শিলালিপি [৪২]

পূর্বে বলা হয়েছে যে, রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত সুলতানী আমলের গৌড়ের শহরতলীর ফিরুযপুর মৌজায় ছোট সোনা মসজিদ অবস্থিত। এই

মসজিদের প্রধান পথের উপরি অংশে আরবী ভাষায় শিলা গাত্রে লিপি উৎকীর্ণ করা আছে। এই লিপি ঐতিহাসিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। শিলালিপির কিছু অংশ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে মসজিদ নির্মাণের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলে তাঁর একজন অমাত্য ওয়ালী মুহাম্মদ কর্তৃক এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে শিলালিপিটির মূল ভাষ্য উল্লেখ করা হলো।

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر و اقام الصلواة و اتى الزكواة و لم يخش الا الله – فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين – و قال النبى صلى الله عليه و سلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا فى الجنة مثلـه – عمارة هذا المسجد الجامع فى عهـد سلطان السلاطين سيـد السادات منبع السعادات ارحـم المسلمين و المسلمات معلى كلمات الحق و الحسنات – المويـد بتائيد الديان المجاهـد فى سبيل الرحمـن خليفـة الله بالحجـة و البرهان – غـوث الاسلام و المسلمين علاء الدنيا و الدين ابو المظفر حسين شاه السلطان الحسينى خلـد الله ملكـه و سلطانـه– بنى هذا المسجد الجامع خالصا مخلصا متوكلا على الله ولى محمد بن عـلى المخاطب بخطاب مجلس المجالس مجلس منصـور– نصـره الله تعالى فى الـدنـيا و الاخرة و تاريخه الميمون فى الرابع عشر من شهر رجب المبارك رجب الله قدره و شانه –

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মসজিদ নির্মাণে ব্রতী হন যে আল্লাহ্ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, নামায প্রতিষ্ঠা করেন, যাকাত আদায় করেন এবং আল্লাহ্ ছাড়া কারও ভয় করেন না।

সত্বরই এসব ব্যক্তি সঠিক পথ প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হবেন। এবং মহানবী (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেন আল্লাহ্ তাঁর জন্যে বেহেশতে অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করেন।

এই জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সুলতানগণের সুলতান, সাইয়েদদের সাইয়েদ, শুভকার্যাবলীর উৎস, মুসলমান নর ও নারীদের প্রতি করুণা প্রদানকারী, সত্য ও কল্যাণময় বাক্যাবলীর সমুন্নতকারী, সার্বভৌম বিচারকের সাহায্য প্রাপ্ত, করুণাময়ের রাস্তায় জিহাদকারী, প্রমাণ ও দলীল সহকারে আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি, ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী আলাউদ্দীন আবুল মুযাফফর হুসাইন শাহ আস–সুলতান আল–হুসাইনী (হুসাইনের বংশধরের অন্তর্ভুক্ত) এর আমলে। আল্লাহ্ তাঁর সাম্রাজ্য ও সালতানাত দীর্ঘস্থায়ী করুন।

সৎ ও নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা রেখে এই জামে মসজিদটি আলীর পুত্র ওয়ালী মুহাম্মদ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এই ওয়ালী মুহাম্মদ মজলিস–উল– মাজালিস ও মজলিস মনসুর উপাধিপ্রাপ্ত অমাত্য। আল্লাহ্ তাঁকে ইহজগত ও পরজগতে সাহায্য দান করুন। এই মসজিদের শুভ তারিখ পবিত্র রজব মাসের চতুর্দশ দিবস। আল্লাহ্ এটির মর্যাদা ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করুন।

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ঃ এই শিলালিপি শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ হয়েছে এবং তা নাস্‌খ লিখন–পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ভাষা ও শব্দগত কোন ভুল এই উৎকীর্ণ লিপিতে পরিলক্ষিত হয় না। এই শিলালিপির সূত্রে ছোট সোনা মসজিদকে একটি জামে মসজিদ হিসেবে গণ্য করা যায়। সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের অনেক গুণগত নামের সাথে এই শিলালিপির সূত্রে আমরা পরিচিত হতে পারি। তাঁকে সুলতানগণের সুলতান, আল্লাহ্‌র রাস্তার জিহাদকারী, সত্য প্রতিষ্ঠাকারী এবং প্রমাণ ও দলীল সহকারে খলীফাতুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুলতান আলাউদ্দীনের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করলে তাঁকে এসব গুণের অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করতে বাধা থাকে না। সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি বাংলার ইতিহাসে

সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। বাংলার সুলতানগণের খলীফাতুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধি উপাধি গ্রহণ সম্পর্কে এর পূর্বে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা পেশ করা হয়েছে। যে অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলার সুলতাগণ 'খলীফাতুল্লাহ' উপাধি মুদ্রায় উৎকীর্ণ করেছিলেন তা সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে তাঁর মুদ্রায় এই উপাধি গ্রহণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র তাঁর শিলালিপিতে এই 'খলীফাতুল্লাহ' উপাধি উৎকীর্ণ হয়েছিল।

এই মসজিদের নির্মাণকারী ওয়ালী মুহাম্মদ বিন আলী সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের একজন উচ্চ পর্যায়ের অমাত্য ছিলেন। সম্ভবত তাঁকে গৌড়ের দক্ষিণাঞ্চলের শাসন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। তাঁর উপাধি ছিল মজলিস-উল-মাজালিস এবং মজলিস মনসুর। সুলতানী আমলের এই জাতীয় উপাধি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাকে বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাঘা মসজিদের শিলালিপি ৪৩

বাঘা স্থানটির প্রাচীনতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে এর পূর্বে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। সুলতান নাসির উদ্দীন নুসরত শাহের আমলে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। আরবী নাস্খ লিখন-পদ্ধতির তুগরা অলঙ্কারিক প্রক্রিয়ায় এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছে।

লিপির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

قال النبي صلى الله عليه و سلم من بنى مسجدا لله فى
الدنيا بنى الله له بيتا فى الجنة — بنى هذا المسجد
الجامع السلطان المعظم المكرم السلطان بن السلطان ناصر
الدنيا و الدين ابو المظفر نصرتشاه السلطان بن حسين
شاه السلطان الحسينى — خلد الله ملكه و سلطانه فى
سنة ثلثين و تسعماية —

[illegible] পৃথিবীতে [illegible] নির্মাণ করেন। [illegible] নাসিরউদ্দীন আবুল মুজাফফর [illegible] সুলতান আল- [illegible] সাম্রাজ্য ও [illegible] ৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়েছে।

এই শিলালিপিতে তাঁদের [illegible] না। তবে [illegible] উৎকীর্ণ [illegible] এর স্থলে [illegible] হয়েছিল। শিলালিপির সূত্র [illegible] এই মসজিদ জামে মসজিদ হিসেবে নির্দেশিত হবে। بنى هذا المسجد الجامع এর بنى শব্দের ماضى معروف এর প্রয়োগ থেকে বলা যায় যে, সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল এবং সেটিকে একটি জামে মসজিদের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল।

কুসুম্বা মসজিদের শিলালিপি ৪৪

কুসুম্বা মসজিদের ভূমি নকশা এবং স্থাপত্যগত বর্ণনা এর পূর্বে পেশ করা হয়েছে। কুসুম্বা মসজিদের দরজার উপরি অংশে যে শিলালিপিটি এখনও বিদ্যমান তার পাঠ নিম্নে দেয়া হলো।

قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا
يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتا مثله فى الجنة مثله
— فى عهد السلطان المعظم المكرم غياث الدنيا و الدين ابو
المظفر بهادر شاه السلطان بن محمد شاه غازى خلد الله
ملكه و سلطانه و اعلى امره و شانه — عز جنده و برهانه
— بنا كرده سليمان دام عدله فى سنة ست و ستين و
تسعماية —

অনুবাদ ঃ মহানবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণকরেন আল্লাহ্ তাঁর জন্যে বেহেশতে অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ আস-সুলতান বিন মুহাম্মদ শাহ গাযী এর শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তাঁর সাম্রাজ্য ও সালতানাত দীর্ঘস্থায়ী করুন। তাঁর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর সামরিক বাহিনী ও রাজত্বের প্রমাণকে সুসংহত করুন। সুলায়মান, আল্লাহ্ তাঁর সুবিচার স্থায়ী করুন, ৯৬৬ হিজরীতে/ ৫৫৮ খৃঃ এই মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

উৎকীর্ণ লিপির ভাষা আরবী। তবে কেবলমাত্র بنا کرده শব্দটি ফারসী। এটি একটি সাধারণ মসজিদ এবং তা সুলায়মান নামক একজন ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। সুলায়মানের কোন পরিচয় জানা যায় না। তিনি সুলতানের কোন অমাত্য হতে পারেন অথবা সেই অঞ্চলের একজন ধণাঢ্য ব্যক্তি হতে পারেন।

রাজশাহী জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপির সংখ্যা হবে প্রায় পঁচিশটি। এছাড়া অনুসন্ধান করলে আরও শিলালিপি রাজশাহীর বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত হতে পারে। উপরে যে কয়টি শিলালিপি পাঠ ও পর্যালোচনা সহ পেশ করা হয়েছে তার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ সম্পর্কের তথ্যে আমরা অবগত হতে পারি। এসব শিলালিপির সাক্ষ্যে বলতে পারি যে, বাংলার সুলতানগণ শরীয়তের বাস্তব প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। রাজশাহী জেলায় প্রতিষ্ঠিত এসব মসজিদ ও মাদ্রাসা তাঁদের সেসব অবদানের কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অতীতের সাথে আমাদের যোগসূত্র কায়েম করে দিয়ে ভবিষ্যত কর্মপন্থা গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে।

রাজশাহী জেলায় মুসলিম আমলের শিল্পকলা

শিল্পকলা সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংগ হিসেবে জনগোষ্ঠীর জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখে এবং তা মানব সভ্যতাকে বিকাশমুখী করে তোলে। তাই সভ্যতা কোন

বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকে না। বরং যুগ, কাল ও ভৌগোলিক বিভাজনের দূরত্ব ও ব্যবধানে তা ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়ে বিকাশ ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। আদি মানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। মানুষ অনুভূতি প্রবণ এক সজীব সত্তা। প্রতিটি মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি ও সৃষ্টিধর্মী আবেগ আছে। কেউ তা প্রকাশ করার সুযোগ পায় এবং কেউ তা পায় না। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। এই সৃষ্টিধর্মী আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়ে যখন গতি লাভ করে তখন তা শিল্পকলা হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রত্যেক মানুষের মাঝে শিল্পী মন আছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যখন এই শিল্পী মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন সে শিল্পী হিসেবে পরিচিত হয়। তবে প্রত্যেকের শিল্প সম্পর্কে কিছু ধারণা বা তার মূল্যায়ন করার প্রবণতা আছে। এ জন্যে শাসন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি নিজে শিল্পী না হয়েও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় শিল্পকলার চর্চা হয় এবং বিকাশ ঘটে।

তুর্কী মুসলমানগণ বিজয়ীবেশে যখন এ দেশে প্রবেশ করেন তখন এক উন্নত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সাথে করে নিয়ে আসেন। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মধ্য এশীয় এবং পারসীয় ধারাকে তাঁরা এখানকার নির্মীয়মাণ ইমারতে প্রতিফলিত করার প্রয়াস পান। মুসলমানদের জীবনবোধ হবে তাওহীদ ভিত্তিক এবং বহিরাগত মুসলমান এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। এ দেশের প্রচলিত রীতিনীতি তাঁরা একেবারে বর্জন করেননি, বরং স্থানীয় জনগণের সাথে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সংশোধন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কিছু দেশজ রীতির প্রচলন অনুমোদন করেছেন। তাওহীদের পরিপন্থী কোন রীতিকে তাঁরা সমর্থন করেননি, বরং প্রতিহত করেছেন। ইসলামের অনুশাসনের পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রয়াসে তাঁরা মসজিদ নির্মাণের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাতে স্থাপত্য--খিলান, গম্বুজ, টাওয়ার ও ছত্রী উপস্থাপন করে সনাতন ইসলামী নির্মাণ কৌশলের সাথে এ দেশের নির্মাণ শিল্পী ও কারিগরের পরিচয় ঘটিয়েছেন। এ দেশের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মশালায় প্রবর্তিত কোন স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা মসজিদের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করেননি। এমন কি মুসলিম শাসনামলের

কোন স্থাপত্য ইমারতে অমুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তবে এ দেশে বাঁশ ও খড় নির্মিত চালাঘরের অনুকরণে তাঁরা ঢালু ও ধনুক বক্র ছাদ নির্মাণ করে মুসলিম স্থাপত্যে এক নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। উপরে রাজশাহী জেলার মসজিদ স্থাপত্যের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এ সবের স্থাপত্য কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এগুলোর মাঝে মুসলমানদের তাওহীদী জীবনবোধের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে এবং সেগুলোর মধ্যে কিছু স্থাপত্য নিদর্শন উন্নত সংস্কৃতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মাঝে এখনও টিকে আছে। আজও তাই মসজিদের মিনার থেকে আযানের প্রাণ স্পর্শী আবেদন মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে চলার জন্যে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করে।

তাওহীদী জীবনবোধ আল্লাহ্র একক সত্তা এবং একমাত্র তাঁরই সৃষ্টি ও ধ্বংস ক্ষমতা অন্তরে ও বাইরে গ্রহণ করা অপরিহার্য বলে ঘোষণা করে। আল্লাহ্ পাক সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এই চিরন্তন সত্যটিকে কথা, কাজ ও আচরণে প্রকাশ করা একজন মুসলমানের অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করা তাওহীদী জীবনবোধের কেন্দ্রবিন্দু। তাই তাওহীদী জীবনবোধের পরিপন্থী কোন কাজ বা আচরণ একজন প্রকৃত মুসলমানের নিকট থেকে সাধিত হওয়া মোটেই অভিপ্রেত হতে পারে না। ইসলামে ভাস্কর্য ও প্রাণীবাচক চিত্রকলা অনুমোদিত নয়। সে জন্যে বাংলার মুসলমান শাসকগণ তাঁদের নির্মিত মসজিদ বা অন্যান্য ইমারত গাত্রে কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি উপস্থাপন করেননি। মুসলমান শিল্পীরা ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতির পরিবর্তে লতাপাতা, তরুরাজি, জ্যামিতিক নকশা ও বিমূর্ত বস্তুকে অলঙ্করণ মটিফ হিসেবে গ্রহণ করে স্থাপত্য ইমারতের সাজসজ্জার কাজ সম্পন্ন করেছেন। রাজশাহী জেলার উপরে উল্লেখিত মসজিদ ও ইমারত গাত্রে যে টেরাকোটা আর্ট বা পোড়ামাটির ফলকে বিভিন্ন অলঙ্করণ প্রক্রিয়া অথবা শিলাখন্ডে খোদাই করা যে কারুকার্য লক্ষ্য করা যায় তাতে তাওহীদী জীবনবোধের পরিপন্থী কোনকিছু উপস্থাপিত হয়নি। বরং মুসলমানদের উন্নত সংস্কৃতি ও জীবনবোধকে শিল্পীগণ অলঙ্করণের ছাঁচে ধরে রেখে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। পোড়ামাটির ফলকে অথবা শিলাখন্ডে

খোদাই করা গোলাপ, পদ্ম, বৃত্তের [illegible] প্রতিরূপ, ফলের নকশা এবং শিকল ঘন্টার প্রতিকৃতি রাজশাহী জেলার মসজিদ স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য অলঙ্করণ রীতি হিসেবে বিদ্যমান আছে।

চিত্রকলার পরিবর্তে ক্যালিগ্রাফী বা লিপিকলাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। কুরআন লিপি শিল্পীর মর্যাদা ইসলামে স্বীকৃত। মুসলিম শাসনামলে বিভিন্ন দেশে লিপি শিল্পীদেরকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করা হয়েছে। এ ফলশ্রুতিতে লিপি শিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলার সুলতানদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় লিপি শিল্পীগণ আরবী লিপির বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে মসজিদ, মাদ্রাসা কিংবা স্থাপত্য ইমারতের শিলাখন্ডে তাঁদের লিপি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রাজশাহী জেলার মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহের শিলালিপি এর সত্যতা প্রমাণ করে। নস্খ, সুলস, রিকা, তাওকী, মুহাক্কাক, রায়হান ও গুবার প্রভৃতি লিখন পদ্ধতিতে এসব লিপি উৎকীর্ণ হয়েছে এবং তুগরা অলঙ্কারিক মটিফ হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে লিপিকলার শ্রী বৃদ্ধি সাধন করেছে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, রাজশাহী জেলায় মুসলিম শাসনামলে যে শিল্পকলা গড়ে উঠেছিল তা মুসলমানদের তাওহীদী জীবনবোধকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। আমাদের অতীত ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করানোর স্বার্থে এসব উন্নত সংস্কৃতির মূল্যায়ন অবশ্যই করতে হবে।

উপরে রাজশাহী জেলার মুসলিম আমলের স্থাপত্য কর্ম, শিলালিপি ও শিল্পকলার পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মুসলিম শাসকগণ তাঁদের স্বকীয় ঐতিহ্যকে এ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাক-মুসলিম আমলের উল্লেখযোগ্য কোন স্থাপত্য নিদর্শন রাজশাহী জেলার কোন অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয় না। তবে তাদের স্থাপত্য বা ভাস্কর্যে কোন লালিত্য ছিল না। মুসলিম শাসকগণ তাঁদের মসজিদ কিংবা ইমারত গাত্রকে অনাবৃত রাখেননি। বরং পোড়ামাটির ফলকে বিমূর্ত রেখা, লতাগুল্ম কিংবা তরুলতার প্রতিচ্ছবি দিয়ে সুশোভিত করে তুলেছেন। এছাড়া উৎকীর্ণ লিপিধারা অথবা রেখা- শৈলী ও লতাগুল্মের অংকন দিয়ে মসজিদ ও ইমারতের শিলাগাত্রকে অলঙ্কৃত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। উপরন্তু মুসলিম

শাসনামলে ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলার যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। উপরে তা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে।

---

১. A. K. M. Yaqub Ali. *Aspects of Society and Culture of the Barind, 1200-1576 A. D.* (Unpublished Ph. D. Thesis), p. 338 (Henceforth *ASCB*).

২. A. H. DAni. *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 55 (Henceforth *MAB*); Shamsuddin Ahmed. *Inscriptions of Bengal*. Vol. IV (Rajshahi : Varendra Research Museum, 1960), pp. 35-38 (Henceforth *IB*).

৩. Wolseley Haig (ed.). *Cambridge History of India*. Vol. III (London : Cambridge University Press, 1928), p. 602; *Bengal District Gazetteers : Malda*, p. 97; *JASB*, N. S. Vol. IV, 1910, p. 32; *MAB*, pp. 58-60; *ASCB*, pp. 338-39.

৪. তাবাকাত-ই-নাসিরী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪২৭।

৫. *Epigraphia Indo-Moslemica* (Henceforth *EIM*), 1917-18, p. 13, plate II.

৬. *ASCB*, p. 336.

৭. *Ibid*, p. 340.

৮. *Ibid*.

৯. *MAB*, pp. 75-76.

১০. *Ibid*, p. 163.

১১. Abid Ali Khan. *Memoirs of Gaur and Pandua*, ed. H. E. Stapleton (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1930), p. 76 (Henceforth *Memoirs*).

১২. A. H. Dani. *MAB*, p. 108.

১৩. S. M. Hasan. *Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal* (Dacca : University Press Ltd., 1979), p. 127, Fig. 23 (Henceforth Mosque Architecture).

১৪. Abid Ali. *Memoirs*, p. 77; A. H. Dani. *Bibliography*, p. 31; S. Ahmed. *IB*. Vol. I* (Rajshahi : Varendra Research Museum, 1960), pp. 104-105.

১৫. Abid Ali. *Memoirs*, P. 77; *JISOA*, Vol. IX, 1941, Calcutta, p. 19.

১৬. A. H. Dani. *MAB*, p. 110.

১৭. A. H. Dani. *MAB*, p. 112.

১৮. S. Ahmed. *IB*, pp. 199-202.

১৯. For detail see. A. H. Dani. *MAB*, pp. 136-140.

২০. S. Ahmed. *IB*, pp. 212-214.

২১. A. H. Dani. *MAB*, p. 160.

২২. S. Ahmed. *IB*, pp. 242-24[illegible]

২৩. A. H. Dani. *MAB*, pp. 162-164.

২৪. For detail see. A. K. M. Yaqub Ali. *ASCB*, pp. 383-390.

২৫. For detail see. *ASCB*, pp. 391-393.

২৬. A. H. Dani. *MAB*, pp. 256-258.

২৭. *Ibid*, p. 258.

২৮. *JPHS*, pp. 409-410; A. H. Dani. *Bibliography*, p. 28; [illegible] Karim. *Corpus*, p. 162; এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), পৃঃ ২৫৫ (সংক্ষেপে মুসলিম মুদ্রা)।

২৯. S. Ahmed. *IB*. Vol. IV, p. 90; A. H. Dani. *Bibliography*, p. 28; *মুসলিম মুদ্রা*, পৃঃ ২৫৫।

৩০. মুসলিম মুদ্রা, পৃঃ ২৩৮।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫।

৩৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—মুসলিম মুদ্রা, পৃঃ ৩৩৯—৩৫০;

A. K. M. Yaqub Ali. Seclect arabic and Persian Epigraphs (Dhaka : Islamic Foundation, 1988), pp. 33-37.

৩৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য S. Ahmed. *IB*. Vol. IV, pp. 46-48; *Select Arabic and Persian Epigraphs*, pp. 38-44.

৩৫. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াযুস সালাতীন*, ইংরেজী অনুবাদ [illegible] (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯০৪) পৃঃ ১১৬—১১৭।

৩৬. প্রাগুক্ত।

৩৭. Ziauddin Desai. "Some new data regarding the pre-Mughal Muslim Rulers of Bengal", *Islamic Culture*, Vol. XXXII, No. I, Hyderabad, 1958, p. 204.

৩৮. S. Ahmed. *IB*. Vol. IV, pp. 73-75.

৩৯. *Ibid*, pp. 94-96; *Select Arabic and Persian Epigraphs*, pp. 53-56.

৪০. *ASR*, Vol. XV, p. 76; *JASB*, Vol. LXIV, 1895, pp. 22-23; S. Ahmed. *IB*. Vol. IV, pp. 104-106.

৪১. *JASB*, Vol. XLIII, 1874, p. 303; *Memoirs*, pp. 157 ff.; S. Ahmed. *IB*. Vol. IV, pp. 158-53; *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vols. XXIV-VI, 1979-81, Dhaka, pp. 30-90.

৪২. *ASR*. Vol. XV. pp. 75-76; *JASB*. Vol. LXIV. 1895. pp. 224-25; *Memoirs*. pp. 79-82; *IB*. Vol. IV. pp. 199-202.

৪৩. *JASB*. part I. 1904. pp. 108-113; *IB*. Vol. IV. pp. 212-214.44.

৪৪. *JASB*. Vol. LXXIII. 1904. pp. 108-117; *IB*. Vol. IV. pp. 242-244.

পঞ্চম অধ্যায়

রাজশাহী জেলা ও আধুনিক যুগ

রাজশাহীর শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রাক–মুসলিম যুগ থেকে শুরু করে শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজশাহী তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। পাল ও সেনদের শাসনামলে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। পাল আমলে প্রতিষ্ঠিত পাহাড়পুরের সোমাপুরা বিহার বৌদ্ধদের জন্যে একটি আবাসিক ধর্মশালা হিসেবে গড়ে ওঠে। এতে বৌদ্ধ আরাধনা প্রক্রিয়া ও নীতি শাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হতো। সেন আমলে শাসকগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদ হিন্দু ধর্মের ধারক ও বাহক। তাঁরা তাঁদের ব্রাহ্মণ্যবাদ হিন্দু ধর্মের শিক্ষা প্রদান ও প্রসারকল্পে ব্রাহ্মণদেরকে ভূমি দান করেছেন। তাম্র শাসন ও পট্টলীতে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে সেন আমলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্রাহ্মণদেরকে ভূমি প্রদানের কথা উল্লেখ আছে। এর পর আসে মুসলিম যুগ। এ যুগে শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়, এবং মুসলিম শাসকগণের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে এ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উল্লেখ্য যে, পাল ও সেন আমলে শিক্ষার পরিধি ছিল সংকুচিত এবং তা ধর্মীয় আরাধনা ও নীতিশাস্ত্র আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলিম শাসনামলে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় সেগুলোতে যে শিক্ষা দেয়া হতো তাতে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক পরিত্রাণের পথ নির্দেশনা থাকতো। জীবন ও বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনকে সেভাবে গড়ে তুলতো এবং জনগণের মধ্যে তার প্রচার ও প্রসার ঘটাতো। এর মূল বুনিয়াদ ছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস এবং একে কেন্দ্র করেই

তাদের জীবনবোধ সৃষ্টি হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অবধি শিক্ষার এই ধারা বাংলার অন্যান্য অংশের ন্যায় রাজশাহীতে চলে আসছিল।

বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভ থেকে রাজশাহী জেলার আলোচ্য ইতিহাসে আধুনিক যুগ গণ্য করা যায় এবং তা বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রসারিত। আলোচনার সুবিধার জন্যে আধুনিক যুগকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যাস করা যেতে পারে। বৃটিশ আমল (১৭৫৭–১৯৪৭), পাকিস্তান আমল (১৯৪৭–১৯৭১) এবং বাংলাদেশ আমল (১৯৭১–চলছে)। রাজশাহী জেলায় এই সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার প্রয়াস পাব।

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার ক্ষেত্রে দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়–একটি পাশ্চাত্য ধারা এবং অপরটি প্রাচ্য ধারা। পাশ্চাত্য ধারায় পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য লাভ করে। এ দেশের উচ্চ শ্রেণীর (বিশেষত হিন্দু) জনগোষ্ঠীকে পাশ্চাত্যের এসব চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ পর্যায়ক্রমে ভার্নাকুলার ও ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফার্সির পরিবর্তে ১৮৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ইংরেজী সরকারী ভাষা হিসেবে চালু করা হয়। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। কাজেই সরকারী চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ করতে এ দেশের এক শ্রেণীর লোক উৎসাহী হয়ে পড়ে। সাধারণত হিন্দু গোমস্তা ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরা এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষার প্রাচ্য ধারা সনাতন শিক্ষা পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। মুসলমানদের জন্যে সনাতন পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা মাদ্রাসায় ইসলামী যাবতীয় অভিজ্ঞানসহ আরবী ফার্সীর পঠন–পাঠন এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অপরপক্ষে গোঁড়া ও কুলীন হিন্দুদের জন্যে টোল ও চতুষ্পাঠীতে বেদ পুরাণ সহ সংস্কৃত ভাষার চর্চা এই প্রাচ্য ধারা প্রতিনিধিত্ব করে। মুসলমানদের চেয়ে অনেক আগে হিন্দু সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ করে চাকরি–বাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃটিশদের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করে তোলে। শাসন ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং বিজাতীদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা নিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ করা

থেকে বিরত থাকেন। কারণ শাসক থেকে শাসিতের পর্যায়ে নেমে যাওয়া তাঁদের জন্যে দুঃখজনক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। অথচ হিন্দুদের জন্যে এটি ছিল কেবলমাত্র শাসকের হাত বদল। মুসলমান শাসকের চেয়ে বিদেশী বৃটিশ শাসক তাদের জন্যে বরং বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। বৃটিশের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির ফলে হিন্দু সম্প্রদায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত লাভবান হয়েছিল। শিক্ষানীতির এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে রাজশাহী জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করবো।

বৃটিশ শাসনামলে রাজশাহী জেলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচ্যের সনাতন ধারা এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক ধারা অব্যাহত ছিল। রাজশাহীতে মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে কাওমী ও খারিজী মাদ্রাসা পদ্ধতি বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে চালু ছিল। অনুরূপভাবে সনাতনপন্থী হিন্দুদের জন্যে টোল ও চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদান চালু ছিল। শিক্ষার আধুনিক ধারায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে প্রাইমারী স্কুল জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়েছিল। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের জন্যে প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে ১৮৬৫ সালে রাজশাহী শহরের বোয়ালিয়াতে গুরু ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহিলা শিক্ষকদের জন্যে ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। বিভাগ পূর্ব বৃটিশ শাসনামলে রাজশাহী জেলায় কতটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া সম্ভব নয়। তবে রাজশাহীতে শিক্ষার উৎসাহ–ব্যঞ্জক হার থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না।

রাজশাহীতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃটিশ শাসনামলে খুব বেশি ছিল না। এ সময় রাজশাহীর জমিদারগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু সংখ্যক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। পরিসংখ্যান নিলে জানা যায় যে, ১৮০১ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় মাত্র আটটি উচ্চ বিদ্যালয় হিন্দু জমিদার ও রাজাদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। তবে ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত রাজশাহী জেলার সর্বত্র পঁচাশিটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব বিদ্যালয় রাজশাহী সদর, নাটোর, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জ মহকুমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে নবাবগঞ্জে সে সময় আরবী ও ফার্সী শিক্ষার প্রতি অধিক আকর্ষণ থাকায় ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে সে অঞ্চলের অধিবাসী রাজশাহীর অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পিছিয়ে ছিল।

তবে পাকিস্তান আমলে নবাবগঞ্জ মহকুমার অধিবাসিগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করে এবং শিক্ষিতের হার তুলনামূলকভাবে অন্যান্য মহকুমার চেয়ে বেড়ে যায়।

প্রাসঙ্গিকভাবে বৃটিশ শাসনামলে রাজশাহীতে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। উল্লেখ্য যে, ১৭৮০ সালে মুসলমান বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টার ফলে ওয়ারেন হেস্টিং সরকারী তত্ত্বাবধানে কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন এবং ঐ বছর আলীয়া মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হয়। এই মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করে যেসব আলিম বের হতেন তাঁরা অনেকেই ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলার অন্যান্য স্থানে আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বর হয়ে উঠেনি। ১৮৭২ সালে হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ফান্ডকে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের জন্যে বরাদ্দ করা হলে সরকার সে ফান্ড থেকে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে তিনটি সরকারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করে। মুসলমান সন্তানদের দীনী শিক্ষার জন্যে রাজশাহী মাদ্রাসা (১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত) এ অঞ্চলে প্রভূত অবদান রেখেছিল। ১৯১৫ সালে নিউ স্কিম মাদ্রাসা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে একমাত্র কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসা ব্যতীত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মাদ্রাসা সরকারী নিউ স্কিম মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়। এতদসত্ত্বেও রাজশাহী মাদ্রাসা এ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং গরীব মুসলমান পরিবারের সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। অনুরূপভাবে নওগাঁতে নিউ স্কিম সিনিয়র মাদ্রাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামী শিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠান বিত্তশালী ও সাধারণ মুসলমানদের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে গেছেন তাঁদের অনেকেই জনগণের মধ্যে ইসলাম সচেতনা সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

বৃটিশ শাসন যুগে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উচ্চশিক্ষার জন্যে ১৮৭৩ সালে রাজশাহী কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথমে দুবালহাটির জমিদার এবং পরবর্তী পর্যায়ে

দিগাপতিয়ার রাজার আর্থিক সাহায্য লাভ করে কলেজটি উচ্চশিক্ষার একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর এতে এম, এ, ও আইন ক্লাস চালু করা হয়। পরে আবার তা তুলে দেয়া হয়। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ ও রাজশাহী কলেজ বৃটিশ শাসনকালে সমমানের ছিল। উচ্চ শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে রাজশাহী কলেজ অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। তবে বিভাগ পূর্ব যুগে নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মুসলমান পরিবারের সন্তানদের পাঠ গ্রহণ এই কলেজে খুব একটা সহজ ছিল না। এই কলেজের আরবী ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন। রাজশাহী কলেজ ছাড়া বিভাগ পূর্ব যুগে নবাবগঞ্জের মনাকোশায় ১৯৩৮ সালে স্থাপিত আদিনা ফজলুল হক কলেজের সন্ধান পাওয়া যায়।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্যে বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে শিক্ষা দফতর সতন্ত্রভাবে খোলা হয়েছে এবং কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্বের চেয়ে তাঁদের বেতন স্কেল ভাল হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৪৪টি। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো ৩৮৮টি।

১৮৪৭ সালের উপমহাদেশ বিভাগের পর হতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে যাওয়ার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়, এবং এই শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্য মুসলমান জনগোষ্ঠী ইংরেজী ও উচ্চ শিক্ষার দিকে এগিয়ে আসে। কারণ প্রশাসন যন্ত্রকে ঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলে শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। এই অবস্থার

প্রেক্ষিতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার সফলকাম উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বিত্তশালী মুসলমানদের আর্থিক সাহায্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। রাজশাহী জেলার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। রাজশাহী সদরে ১৯৪৭ সালের পর হতে ৭২টি উচ্চ বিদ্যালয় বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজশাহী সদরে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩টি। এর পর বাংলাদেশ আমলে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমায় বৃটিশ শাসনামলে প্রায় পঁয়ত্রিশটি এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে প্রায় একশতের উপরে উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। নবাবগঞ্জ মহকুমায় বৃটিশ আমলে মাত্র ৬টি বিদ্যালয় ছিল। সুলতানী আমলে গৌড় বাংলার রাজধানী শহর হওয়ায় পরবর্তীকালেও এই অঞ্চলে আরবী ও ফার্সী পড়াশুনার প্রতি মুসলমানদের ঝোঁক ছিল। সে জন্যে বৃটিশ শাসনামলে নবাবগঞ্জের মুসলিম অধিবাসিগণ আরবী-ফার্সী পড়াশুনার প্রতি আকৃষ্ট বেশি ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সাল থেকে স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় পাকিস্তান আমলে নবাবগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে ৫০টি এবং বাংলাদেশ আমলে ২৮টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। স্মর্তব্য যে, বিভাগ-পূর্ব যুগে নবাবগঞ্জে ইংরেজী ও উচ্চশিক্ষার হার তেমন আশাব্যঞ্জক ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে তুলনামূলকভাবে রাজশাহীর অন্যান্য মহকুমার চেয়ে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিতের হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। রাজশাহী জেলার মধ্যে নাটোর একটি প্রাচীন জনপদ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম বিজয়ের পরেই এটি একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে নাটোর তার প্রাচীন গৌরব অনেকটা ধরে রেখেছে।১৮৩৫ সালে উইলিয়াম এডামের শিক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১০টি বাংলা স্কুলের সাথে নটোরে ৪টি আরবী-ফার্সী শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল। বৃটিশ আমলে নাটোরে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। আনুমানিক ৫ থেকে ১০ এর মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয় নাটোর মহকুমায় স্থাপিত হয়েছিল। তবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে প্রায় ৮০টি বালক উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৭ টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রসঙ্গত উইলিয়ম এডামের রিপোর্টের সূত্র ধরে বলা যায় যে, নাটোরে বৃটিশ শাসনামলে যে চারটি আরবী-ফার্সী শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল, তাতে মুসলমান ছাত্রদের সাথে চাকরি লাভের আশায় হিন্দু বালকগণও পড়াশুনা করতো।

এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'The Persian Schools are nearly as much frequented by the Hindus as by the Muhammadans for the Persian language is considered as a requisite accomplishment for every gentleman, and it is absolutely necessary for those who are candidates in the court of law". ct. William Adam, *Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar* (Calcutta, 1868), p.74; M. Martin, *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India,* Vol. III (Delhi : Cosmo Publication, Reprint, 1976, first print, 1838), P. 710. কারণ ১৮৩৭ সালের ১লা এপ্রিলে ইংরেজীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পূর্বে ফার্সী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু ছিল।

প্রাসঙ্গিকভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে রাজশাহী জেলায় মাদ্রাসা শিক্ষার অগ্রগতির উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অনুরূপ আলীয়া মাদ্রাসা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বতন্ত্র মাদ্রাসা বোর্ড এটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার কিতাবপত্র ও সরঞ্জামাদি ঢাকাতে স্থানান্তরিত করে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। পরবর্তীতে এটির জন্যে বখশীবাজার এলাকায় স্থায়ীভাবে ইমারত নির্মাণ করা হয় এবং বর্তমানে সেখানেই তা অবস্থিত। মাদ্রাসা বোর্ডের নতুন গৃহ নির্মিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) শতকরা নব্বই জন লোক মুসলমান এবং তাঁদের অধিকাংশ ধর্মভীরু। কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল খুব বেশি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্নে ইসলামী বিধান অনুযায়ী পাকিস্তান পরিচালনার অঙ্গীকার থাকলেও পাকিস্তানের

শাসকগোষ্ঠী সে দিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। বরং তাঁরা বিজাতীয় কায়দায় সব কিছু পরিচালনা করেছেন। ইসলামী অভিজ্ঞানের প্রতি তাঁদের ঔদাসীন্যতার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা পাকিস্তান শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন বিকাশ লাভ করতে পারেনি। ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা ও সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা ছাড়া যা পূর্ব থেকেই সরকারী ছিল অন্য কোন মাদ্রাসা পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে জাতীয়করণ করা হয়নি। ইসলাম প্রিয় সাধারণ মুসলমানদের সাহায্য ও সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে, এবং জনগণকে ইসলামের বিশ্বাস, আকীদা ও আচার–অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান দানের প্রচেষ্টা চলছে। ইংরেজী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমান লাভের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বহু আন্দোলন করতে হয়েছে এবং পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে তাঁরা দাবি আদায়ের ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে না হলেও আংশিকভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ আমলে সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষার প্রতিটি শাখা খোলা হয়েছে এবং প্রতিটি পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার সমমান লাভ করেছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর অনেকের আশংকা ছিল যে, মাদ্রাসা শিক্ষা স্তিমিত হয়ে পড়বে । কিন্তু এর বিপরীত অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। মাদ্রাসার সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গেছে এবং মাদ্রসার ছাত্র সংখ্যাও আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি শুভ লক্ষণ বলে ধরে নেয়া যায়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মাদ্রাসার সংস্কারকৃত পাঠ্যক্রম প্রকৃত অর্থে ইল্‌ম বা ইসলামী অভিজ্ঞানে পন্ডিত ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারছে না। ফলে পূর্বের ন্যায় আমাদের কাওমী ও খারিজী মাদ্রাসার দিকে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষার আবশ্যকতা আমরা কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না। পাকিস্তান আমল থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ইতিবাচক ভূমিকা এ জন্যে প্রশংসার্হ।

রাজশাহী জেলায় মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে অনেক মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। নিম্নে রাজশাহী জেলার মাদ্রাসাসমূহের মহকুমাওয়ারী পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

মহকুমা	দাখিল মাদ্রাসা	আলিম মাদ্রাসা	ফাযিল মাদ্রাসা	কামিল মাদ্রাসা
রাজশাহী সদর	৩৯	৮	৫	১
নবাবগঞ্জ	৪২	৯	৭	২
নাটোর	২৮	৫	৫	১–
নওগাঁ	৭৭	১৩	১৬	১

রাজশাহী জেলার মাদ্রাসার উপরোক্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বৃটিশ শাসনামলে রাজশাহী জেলায় তেমন উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসার অস্তিত্ব জানা না গেলেও পরবর্তীতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে বেসরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে, যা এ অঞ্চলের মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায়তা করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

উচ্চশিক্ষার জন্যে বৃটিশ আমলে ১৮৭৩ সালে রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কলেজ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৩৮ সালে আদিনা ফজলুল হক কলেজ স্থাপিত হয়। এরপর ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান শাসনামলে নওগাঁ বি, এম, সি, কলেজ, নাটোর এস, এন, কলেজ, রাজশাহী নিউ ডিগ্রী কলেজ এবং আরো এ জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ আমলে প্রতিটি উপজেলায় একটি বা দুটি করে কলেজ গড়ে উঠেছে। রাজশাহী জেলায় কলেজের সংখ্যা প্রায় সত্তরটি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া রাজশাহীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এটি দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৩ সালের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাকট অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিশেষ করে রাজশাহী কলেজের সে সময়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডঃ ইতরাত হুসাইন জুবেরীর

প্রচেষ্টায় রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজশাহী শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব মাদার বখ্শের অবদানও স্বীকার করতে হয়। প্রাথমিক অবস্থায় রাজশাহী কলেজে সকাল সিফটে স্নাতকোত্তর কয়েকটি বিষয় খোলার মধ্য দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টারস পাশ করে শিক্ষার্থিগণ বের হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ডঃ ইতরাত হুসাইন জুবেরী। এর পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে রাজশাহী শহর থেকে তিন মাইল পূর্বে নাটোর-ঢাকা মহাসড়কের উত্তর পাশে এক হাজার একর জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং সে মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ভবন, গ্রন্থাগার, প্রশাসন ভবন, আবাসিক ছাত্রাবাস এবং শিক্ষক কর্মচারীদের বাসভবনের নির্মাণ কাজ পর্যায়ক্রমে হাতে নেয়া হয়। বর্তমানে ক্যাম্পাস পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে। মতিহারের সবুজ চত্বর এখন মনুষ্য কলকাকলিতে উদ্দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। রাজশাহী বিভাগের সবকটি বৃহত্তর জেলা এবং খুলনা বিভাগের বৃহত্তর খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার ডিগ্রী কলেজসমূহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত।

বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান বিভাগসমূহ ছয়টি অনুষদের অন্তর্ভুক্ত। কলা অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, বাণিজ্য অনুষদ, আইন অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ এবং জীবও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদ। এসব অনুষদে শিক্ষাদান বিভাগের সংখ্যা তিরিশটি। বর্তমানে স্নাতক, সম্মান এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষকের সংখ্যা পাঁচ শতের উপরে। ছাত্রছাত্রীদের এই ক্রমবর্ধমান চাপ বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, উত্তরাঞ্চলে সত্বর আর একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়া প্রয়োজন। স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা দানের পাশাপাশি বর্তমানে এম. ফিল ও পি এইচ. ডি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে। উচ্চতর গবেষণা (এম. ফিল ও পি এইচ. ডি) কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাকট অনুযায়ী ১৯৭৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ নামে একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে এরূপ প্রতিষ্ঠান আর নেই। এই

ইনষ্টিটিউট থেকে এম, ফিল ও পি এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করে অনেকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে ১৯৪৯ সালে এখানে একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়েছে, এবং ১৯৫৩ সাল থেকে সরকার এটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর এটির কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। উত্তরাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উন্নয়নকল্পে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালে রাজশাহীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। রাজশাহী শহরের উত্তর-পশ্চিম অংশে একশত দুই একর জমির উপর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুরম্য ভবনসমূহ নির্মিত হয়। বাংলাদেশের অন্য কোন মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাস এত সুন্দর নয়। উপরন্তু রাজশাহী কলেজ হাসপাতালটি উন্মুক্ত ও বৃহৎ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রোগীদের রোগ নিরাময়ের জন্যে তা অনুকুলোপযোগী। প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজের পরই রাজশাহী মেডিকেল কলেজের স্থান।

প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় (বর্তমানে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী)

১৯৬৪ সালে উত্তরাঞ্চলের প্রকৌশল শিক্ষার অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সরকার এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রাজশাহী শহর থেকে তিন মাইল পূর্বে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম দিক সংলগ্ন কাজলা মৌজার একশত বাহাত্তর একর জমির উপর এই মহাবিদ্যালয়ের ভবনসমূহ ও আবাসিক ইমারত নির্মিত হয়। এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং পরে তা বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী নামে অভিহিত হয়। একসাথে ঢাকা-জয়দেবপুরের, চট্টগ্রামের এবং খুলনার প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় বাংলাদেশ ইনাস্টিটিউট অব টেকনোলজী নামে সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে।

রাজশাহী বি. আই. টি তে সিভিল ইলেটিক্যাল ও মেকানিক্যাল বিভাগে শিক্ষাদান করা হয়।

সরদহ পুলিশ একাডেমী

সরদহ পুলিশ একাডেমী রাজশাহী জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। বৃটিশ ভারতে আসাম ও বাংলা প্রদেশের পুলিশ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্য ১৯১২ সালে সরদহতে পদ্মা নদীর পূর্বে তীরে পুলিশ ট্রেনিং কলেজ হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ- ভারতীয় সেনাাহিনীর মেজ. এইচ. চ্যামনী এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান আমলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পুলিশের সব কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ এখানে সম্পন্ন হতো। ১৯৬৪ সালে এই কলেজের নতুন নামকরণ হয় পুলিশ একাডেমী। এই একাডেমীর চত্বর অতি মনোরম। এই একাডেমী আবাসিক এলাকাসহ একশত বিয়াল্লিশ একর জমির উপর অবস্থিত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এটি পুলিশ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণদানের জন্যে একটি একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ

রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে প্রথম ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে, এবং রাজশাহীর সরদহের মোখতারপুর মৌজায় একশত বিশ একর জমির উপর দ্বিতীয় ক্যাডেট কলেজ ১৯৬৪ সালে স্থাপিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের নামানুসারে এটির নামকরণ হয় আইয়ুব ক্যাডেট কলেজ। পরবর্তীতে এটি রাজশাহী কলেজ ক্যাডেট হিসেবে পরিচিত। অত্যন্ত শৃঙ্খলাবোধের মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ এই কলেজ থেকে বের হয়ে এটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোয় এবং জাতির বৃহত্তর কর্মকান্ডে মেধা ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে আসছেন।

এছাড়া রাজশাহীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, চারুকলা মহাবিদ্যালয়, আইন মহাবিদ্যালয়, সিল্ক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্র, শরীর-চর্চা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, পোষ্টাল ট্রেনিং একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের উপর গবেষণার উপাত্ত ও উপকরণের জন্যে রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের নাম অবশ্যই স্মরণযোগ্য। উত্তরাঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহের জন্যে ১৯১০ সালে প্রথমে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়েছে এবং পরে তা মিউজিয়মের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটি এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীনে রয়েছে।

উপরের এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে,রাজশাহী বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে বিশিষ্ট অবস্থানে রয়েছে।

সাহিত্য ও ইতিহাস

সাহিত্য ও ইতিহাসে ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতির জীবন-দর্শন ও জীবনধারা প্রতিবিম্বিত হয়। ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা একজন ব্যক্তিকে যেমন পরবর্তী প্রজন্মের নিকট স্মরণীয় করে রাখে তেমনি তা একটি জাতিকে গৌরবময় ও অনুকরণীয় করে তোলা। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজশাহী একটি সম্মানজনক অবস্থানে রয়েছে। আধুনিককালে রাজশাহীতে এমন কিছু ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টিতে এবং ইতিহাস রচনায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন। এ পর্যায়ে তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। সে জন্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিখ্যাত দু' একজন সাহিত্যসেবী ও ইতিহাস রচয়িতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা পেশ করে বিষয়টির সাথে পরিচিতি করার প্রয়াস পাবো।

সাহিত্যের পরিমন্ডল অতি ব্যাপক। সাহিত্যে সমসাময়িক যুগের প্রতিফলন ঘটে। কাব্য, গল্প, নাটক কিংবা উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজের সংস্কার অথবা বিশেষ কোন দিকের নির্দেশনা দান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উনবিংশ

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজশাহীতে সাহিত্য সৃষ্টির যে ধারা চলছিল তাতে সমাজের সংস্কারের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে। মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর লেখায় মুসলিম সমাজ সংস্কারের এ ধারাটি ফুটে উঠেছে। ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে মির্জা ইউসুফ আলী রাজশাহী জেলাধীন দুর্গাপুর থানার আলীয়াবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ ইরানের ইস্পাহান নগরী থেকে এ দেশে আসেন। মির্জা ইউসুফ আলী আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথমে স্কুল শিক্ষক হিসেবে চাকুরি জীবন শুরু করেন এবং পরে তিনি সাব-রেজিস্টার পদে যোগদান করেন। রাজশাহী শহরের হেতম খাঁ মহল্লায় মির্জা ইউসুফের নির্মিত 'মির্জাবাগ ভিলা' এখনও তাঁর স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি একজন সমাজসেবী, কর্মঠ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। মুসলিম সমাজ সে সময় সবদিক থেকে পিছিয়ে ছিল। অজ্ঞতার কারণে অনেক কুসংস্কার ও হিন্দু আচার অনুষ্ঠান মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিল। মির্জা ইউসুফ আলী সমাজের মধ্যে চেতনাবোধ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এবং তাদের ইসলামের শাশ্বত জীবনবোধের সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী হন। তাঁর মৌলিক রচনা, 'দুগ্ধ সরোবর' প্রথম প্রকাশিত একটি কওমী পুস্তিকা। রূপক গল্পের সাহায্যে এই গ্রন্থে মুসলিম সমাজের দুর্দশার কারণ চিহ্নিত করে তার দূর করার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরতে পারলে মুসলমানগণ পুনরায় কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে আলোর পথে উত্তরণ হতে পারবেন এবং তাঁদের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। মির্জা ইউসুফ আলীর দ্বিতীয় অমর গ্রন্থটি হলো প্রথিত যশা মুসলিম দার্শনিক ও পন্ডিত ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়া-ই-সাআদত' এর বঙ্গানুবাদ 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'। তিনি পাঁচ খন্ডে বিভক্ত করে এ গ্রন্থটির অনুবাদ শেষ করেন। ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক পরিত্রাণের পথ ও পন্থা এ গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। একজন ব্যক্তিকে প্রকৃত মুসলমান হতে হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যেসব করণীয় আছে সেগুলো সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুক্তি দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'খোশ খবর' মির্জা সাহেবের আর একটি মৌলিক রচনা। এই পুস্তিকায় বাংলাদেশে ইসলাম মিশনের প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ সম্পর্কে

আলোচনা করা হয়েছে। 'অন্তিমকালের কর্তব্য' মির্জা সাহেবের আর একটি গ্রন্থ। অন্তিমকাল উপস্থিত হলে মরণ পথ যাত্রী ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কি করা কর্তব্য এবং মৃত্যু অন্তে মৃতের কল্যাণের জন্যে কি কি কাজ করা প্রয়োজন এই গ্রন্থে তার বিশদ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও মির্জা সাহেবের হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র ইতিহাস এবং অন্যান্য পান্ডুলিপি ছিল যা নষ্ট হয়ে গেছে বলে অনুমান করা হয়। মোটকথা মির্জা ইউসুফ আলী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে হতোদ্যম ও ঘুমিয়ে পড়া মুসলিম সমাজে ইসলামী জীবনবোধের ভিত্তিতে প্রাণ সঞ্চারের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কাজেই ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে মির্জা সাহেবের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

রাজশাহীর যেসব লেখক পুঁথি সাহিত্য, ধর্মীয় গ্রন্থ, নাটক ও উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে দোস্ত মুহাম্মদ নিয়াজী, মৌলবী এনায়েত কাজী, আলহাজ্জ করিম বক্স সরদার, মুহাম্মদ হোসেন উল্লাহ্, হাজী কিয়ামতুল্লাহ্, মেহেরউদ্দীন খান, মাওলানা দেওয়ান নাসিরউদ্দীন, মোবারক আলী এবং আব্দুস সামাদের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজশাহী শহর উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠার ফলে বর্তমানে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে অনেক বিজ্ঞজন প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

বৃটিশ শাসনামলে রাজশাহীতে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের সন্ধান মিলে যাঁরা ইতিহাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ ক্ষেত্রে হিন্দু পন্ডিতগণ প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। কালীনাথ চৌধুরী সর্বপ্রথম রাজশাহী জেলার তথ্য নির্ভর ইতিহাস রচনা করেছেন। এটি ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে তাঁর এ গ্রন্থে মুসলমান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তেমন আলোচনা নেই। এ গ্রন্থে হিন্দুদের শ্রেণী বিন্যাস এবং রাজশাহীর জমিদারদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে জনাব কাজী মোহাম্মদ মিছের দুই খন্ডে প্রায় সাতশত পৃষ্ঠায় রাজশাহীর ইতিহাস রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে স্থান, জনগোষ্ঠী, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃতি ও লোকাচারের উপর বিস্তারিত ও তথ্য ভিত্তিক আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অক্ষয় কুমার

মৈত্রেয় (১৮৬১–১৯৩০) অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। নদীয়া জেলায় তাঁর জন্ম হলেও তিনি স্থায়ীভাবে রাজশাহীতে বসবাস করেছেন। তিনি স্বদেশের ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াসী ছিলেন। বিদেশী লেখকগণ এ দেশের বীর সন্তানদের সম্পর্কে যে মিথ্যা অপবাদ দাঁড় করেছিলেন তিনি সেসব প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে খন্ডন করে জাতির সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'সিরাজউদ্দৌলা' এবং 'মীর কাসিম' এ দেশের গণমানসে নতুন আশা ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর 'গৌড় লেখমালা' বাংগালীর গৌরবময় অতীতের উদ্‌ঘাটনের এক সার্থক প্রয়াস। গবেষণাধর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার জন্যে স্যার যদুনাথ সরকার রাজশাহীর গৌরব হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যশস্বী হয়ে আছেন। স্যার যদুনাথ সরকার (১৮৭০–১৯৫৮) সিংড়া থানার করচমারিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নিজ প্রতিভা বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস–চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। তিনি উঁচুদরের একজন গবেষক ছিলেন। পাটনার খোদা বখ্‌শ লাইব্রেরীতে তিনি গবেষণা করতেন। আরবী ও ফার্সী ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল। স্যার যদুনাথ সরকার মুঘল বংশের বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং বাদশাহ আলমগীর আওরংগজেবের উপর গবেষণাধর্মী কাজ করে গেছেন। বাদশাহ আওরংগজেবের উপর তিনি পাঁচ খন্ডে ইতিহাস রচনা করেছেন। মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা ও মুঘল বংশের পতনের উপর তিনি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত 'হিস্টি অব বেংগল' ২য় খন্ড বাংলার সুলতানী ও মুঘল যুগের ইতিহাসের উপর এক অনন্য গ্রন্থ। স্যার যদুনাথ সরকার তাই একজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রাজশাহীর পন্ডিত ও বিদগ্ধ জনেরা পিছিয়ে ছিলেন না, বরং তাঁরা পরবর্তী গবেষকদের জন্যে পথিকৃৎ হয়ে আছেন।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

রাজশাহী জেলায় মুসলমান ও হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাস। অন্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে ধর্মান্তরিত স্থানীয় খৃষ্টানগণ শহরে বাস করে। এছাড়াও উপজাতীয় লোকদের

মধ্যে রাজশাহীর গ্রামাঞ্চলে (বিশেষ করে উত্তর–পশ্চিম অংশে) সাঁওতাল বাস করে। বৃটিশ শাসনামলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যা গণনায় শতকরা ২১ জন হিন্দু এবং শতকরা ৭৯ জন মুসলমান দেখানো হয়েছে। পরবর্তীকালে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে গেছে এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে রাজশাহীতে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা সাতানব্বইয়ের কম হবে না। বৃটিশ শাসনামলে রাজশাহীতে হিন্দু জমিদরগণ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহী সদর সহ জেলার প্রতিটি মহকুমা শহরে হিন্দুদের আরাধনার জন্যে মন্দির, পূজামন্ডপ ও ধর্মসভা স্থাপিত হয়েছিল এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্যে নৃত্যমঞ্চ ও নাট্যশালা নির্মিত হয়েছিল। তাদের ধর্ম ও জীবনবোধের সাথে এরূপ প্রতিষ্ঠান সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

মুসলমানদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধ হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। তাঁরা আল্লাহ্‌র তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত নিয়েই যাবতীয় কার্যক্রম নির্ধারণ ও পরিচালনা করেন। রসূলের প্রদর্শিত পথকে তাঁরা মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে গণ্য করে থাকেন এবং সেভাবে জীবন–যাপনের ছক তৈরি করেন। সে জন্যে মুসলমানগণ মসজিদকে আল্লাহ্‌র ঘর হিসেবে ধরে নিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রথম ও প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেন। মসজিদকে কেন্দ্র করেই তাঁদের জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ আবর্তিত হয়ে থাকে। মুসলমানদের জীবনবোধ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে যেমন পৃথক তেমনি তাদের সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞা আছে। সদগুণাবলীর কর্ষণ ও বিকাশ সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে মুসলিম জীবন গতিশীল করে তোলে। তাই মুসলিম সংস্কৃতি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সে কারণেই মসজিদ যেমন নামায আদায়ের স্থান তেমনি তা পারলৌকিক পরিত্রাণের পথে অন্যান্য কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুলতানী ও মুঘল শাসনামলে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং সেগুলো মুসলমানদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে। বিংশ শতাব্দীতে বস্তুবাদী চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটার কারণে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকট যুক্তিবাদী হয়ে উঠছে এবং তা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের ব্যাপারে শৈথিল্য বয়ে আনছে। এতদসত্ত্বেও আধুনিক যুগেও রাজশাহী সদর সহ

মহকুমা শহরগুলোতে জনগণের অর্থে মসজিদ নির্মিত হয়ে মুসলিম সমাজকে পথ নির্দেশনা দান করছে। উদাহরণ হিসেবে বৃটিশ আমলে নির্মিত রাজশাহী শহরের সাহেব বাজার মসজিদ এবং হেতম খাঁ মসজিদের নাম উল্লেখ করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে জেলা ও মহকুমা শহর ছাড়াও রাজশাহীর থানাগুলোতে এবং অন্যান্য স্থানে মসজিদের জন্যে সুন্দর ইমারত তৈরি হয়েছে। এসব মসজিদে শিশু কিশোরদের জন্যে কুরআন ও প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জামে মসজিদে ধর্মীয় ও ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিষয়ে প্রায়ই কার্যকর কর্মসূচী গৃহীত হয়ে থাকে এবং এসব ইসলামের বিভিন্ন দিকের সাথে পরিচিতি করার সুযোগ করে দেয়।

বৃটিশ আমলে স্তিমিত মুসলিম সমাজকে নব জাগরণের মন্ত্রে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে রাজশাহীতে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৮৮৪ সালে রাজশাহীতে 'নূর আল-ইমান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মির্জা ইউসুফ আলী এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তৎকালের প্রসিদ্ধ আলিম, ফাযিল ও শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে 'নূর আল-ইমান সমাজ' গঠিত হয়েছিল। এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান বালক-বালিকাদের জন্যে ধর্মীয় ও নীতি উপদেশ সম্পর্কিত সহজ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, বয়স্ক নর-নারীদের জন্যে হিতকর গৃহপাঠ্য ও অবসর পাঠ্যপুস্তক ও পত্রিকা প্রচার করা এবং আরবী-ফারসী ও ইংরেজী ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা। মোটকথা ইসলাম প্রচারের বাস্তব প্রক্রিয়া গ্রহণ করে মুসলিম সমাজকে পরিশীলিত করা এবং তার অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এই সমাজ গঠিত হয়েছিল। 'মিহির' ও সুধাকর পত্রিকায় 'নূর আল-ইমান সমাজকে' মুসলমান ধর্ম,মুসলমান জ্ঞান ও মুসলমান বিজ্ঞান প্রচারক সমিতি বলে অভিহিত করা হয়। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার পর মির্জা ইউসুফ আলী 'কিমিয়া-ই-সা' আদাত' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'সৌভাগ্য স্পর্শমনি' লিখতে শুরু করেন এবং তা এই সমাজের উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়। এই সমাজের প্রকাশিত পুস্তকাবলীর মধ্যে মির্জা সাহেবের 'সৌভাগ্য স্পর্শমনি' ও 'দুগ্ধ সরোবর' এবং মুন্সী ছমিরউদ্দীন

আহমদ বিরচিত 'ওয়াজুল মোমেনীন' ও মুন্সী জোবেদ আলী প্রণীত 'তালিমে নামায' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯১ সালের জানুয়ারি মাসে মির্জা ইউসুফ আলীর নেতৃত্বে রাজশাহী শহরে 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম ' নামে এক সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজশাহী শহরের হেতম খাঁ মসজিদে রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বহু সংখ্যক ইসলামী অভিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' ইসলাম ধর্মের উন্নতি, মুসলমানদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনা, হালাল রুজির পথ প্রদর্শন এবং মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারের ব্রত নিয়ে গঠিত হয়েছিল। 'রাজশাহী মহামেডান এসোসিয়েশন' এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের সার্বিক উন্নতি বিধান করা এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। উপরন্তু ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'রাজশহী জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতি' রাজশাহীর মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির জন্যে সরকারীভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বিশ্বের মুসলিম উম্মার সাথে সংহতি প্রকাশের ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয় এটির তত্ত্বাবধান করে থাকে। বায়তুল মুকাররম, ঢাকাতে এর প্রধান কার্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশ ও জাতির জন্যে প্রভূত অবদান রাখছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বহুবিধ। ইসলামী জীবন-বিধানের বিভিন্ন দিকের উপর গ্রন্থ প্রকাশ করা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যের মধ্যে গণ্য। মুসলিম সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, আইন ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর অসংখ্য গ্রন্থ এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শিশু সাহিত্যের উপর অনেক পুস্তক এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এসব পুস্তক বাংলাদেশের শিশু কিশোরদের চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা

খোলা হয়েছে। রাজশাহীতে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় অফিস আছে। এটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রম প্রশংসার্হ। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ইসলামী জ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে শিশু কিশোরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক এবং তা তাদের চরিত্র গঠনেও সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। নাটোর, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা অফিস আছে। এসব প্রতিষ্ঠান জনগনকে ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করছে। উপরন্তু রাজশাহীতে ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ ইসলামের মূলনীতি, শুদ্ধ কিরাআত, ব্যবহারিক বিষয়সমূহের সাথে পরিচিত হওয়া ছাড়াও প্রাথমিক চিকিৎসা, কৃষি, পশু পালন ও মৎস্য চাষ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞান লাভ করছেন তাতে তাঁরা নিজেদের উন্নতি করা ছাড়াও দেশ ও জাতির কল্যাণ করতে পারবে। এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে যে ভূমিকা পালন করছে তা নিংসন্দেহে প্রশংসার্হ।

কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতি

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ তেমন অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করতে পারলে তবে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হতে পারে এবং তার ফলে জনগণের সার্বিক উন্নতি সম্ভব। রাজশাহী জেলার কৃষি জমি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। বরেন্দ্রর উঁচু ও শক্ত মাটি দ্বারা গঠিত ভূমি। পদ্মার অববাহিকা ধরে প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি যার মাটি বাদামী ও দোঁআশ প্রকৃতির । তৃতীয় শ্রেণীর ভূমি, বিল, ঝিল, খাল ও নালা সংযুক্ত নিচু অঞ্চলের জমি। রাজশাহী জেলার এসব প্রকৃতির জমিতে ধান, পাট, ইক্ষু, গম ও রবি শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ জেলার উৎপাদিত ধান স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটানোর পর উদ্বৃত্ত থাকে এবং বাংলাদেশের অন্য জেলার ঘাটতি পূরণের জন্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীর (বরেন্দ্রের উঁচু) ভূমিতে আমন ধান অত্যধিক ভাল হয় এবং এ থেকে উচ্চমানের চাল প্রস্তুত হয়। বর্তমানে প্রায় সব শ্রেণীর জমিতে বছরে তিনবার ধান উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ জেলার

ইক্ষু একটি অর্থকরী ফসল। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ইক্ষু দিয়ে রাজশাহীর তিনটি চিনিকল চলে। এসব চিনিকল থেকে অতি উন্নতমানের চিনি প্রস্তুত হয় এবং এর ব্যবস্থাপনায় ক্রটিমুক্ত করতে পারলে তা আমাদের এ অঞ্চলের প্রয়োজন মিটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্যে রপ্তানি করা যেতো। রাজশাহীর আম একটি অর্থকরী ফসল। নবাবগঞ্জ ও রাজশাহী সদরে যে আম উৎপন্ন হয় তা বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহে বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে । আমের প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা থাকলে আমের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হতো এবং জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হতো।

রাজশাহীর রেশম শিল্প, তাঁত শিল্প ও লাক্ষা বা গালা শিল্প অর্থকরী শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে রেশম শিল্পের এক গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। অবলুপ্ত মসলিনের সমগোত্রীয় রেশম শিল্প সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং তখন বিপুল পরিমাণে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। রাজশাহী জেলার ভোলাহাট, শিবগঞ্জ ও চারঘাট থানায় ব্যাপকভাবে তুঁতের চাষ হতো এবং তা থেকে রেশমগুটি প্রস্তুত হতো। এর থেকে রাজশাহীর বনেদী তাঁতীরা রেশম ও সিল্কের বিভিন্ন প্রকারের কাপড় তৈরি করতো। বৃটিশ আমলে রাজশাহীর সিল্কের কাপড় বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান আমলে পর্যায়ক্রমে রেশম সিল্কের উন্নয়নের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রেশম শিল্পের উন্নতির জন্যে বাংলাদেশ আমলে বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড গঠন করা হয় এবং এর প্রধান অফিস রাজশাহীতে স্থাপন করা হয়। রেশম শিল্পের উন্নতির জন্যে সেরিকালচার বোর্ড ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। রাজশাহীর সিল্কশাড়ী দেশে বিদেশে সমভাবে সমাদৃত। রাজশাহীর সেরিকালচার বোর্ড যে ব্যাপক কর্মসূচী ও প্রকল্প হাতে নিয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে বহু বেকার লোকের কর্ম সংস্থান হবে এবং বিদেশে রেশমজাত দ্রব্য রপ্তানী করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। তাঁত শিল্পে রাজশাহীর বেশ সুনাম আছে। বৃটিশ আমলে তাঁতীরা সিল্ক কাপড় বুনোনে খুব সিদ্ধহস্ত ছিল। রাজশাহীর মটকা নামক বিশেষ প্রকারের সিল্কের খ্যাতি ছিল। এখনও মটকা সিল্কের কদর আছে। সিল্ক ছাড়াও সাধারণ তাঁতীরা সুতিবস্ত্র

প্রস্তুত করে থাকে। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে, রাজশাহী বিভাগের পাঁচটি বৃহত্তর জেলার মধ্যে তাঁত শিল্পে রাজশাহী তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। রাজশাহীর তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্যে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সহজ শর্তে তাঁতীদের ঋণ দিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। লাক্ষা বা গালা চাষ বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই লাক্ষা শিল্পের প্রধান কেন্দ্র শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট এবং নাচোল থানায়। এই গালা শিল্পের উন্নতির জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তা অবশ্যই অবদান রাখবে। এই সব প্রধান শিল্প ছাড়াও রাজশাহীর কাঁসার বাসন এবং নবাবগঞ্জের নকশি কাঁথার বেশ সুনাম আছে। এসব শিল্পের বিকাশের জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পরিশেষে বলা যায় যে, রাজশাহী জেলার কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন অগ্রগতির যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে রাজশাহী জেলা তথা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অন্তত কিছু অবদান রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার।

প্রসঙ্গত অষ্টাদশ শতকে রাজশাহী জেলার-ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মুগল সম্রাট থেকে দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের যে অধিকার লাভ করে তাতে করে বাংলার ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অবলম্বন করা হয়। কোম্পানী ভূমি চাষীদের স্বার্থের প্রতি কোন নজর দেয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। বরং অধিক হারে রাজস্ব সংগ্রহ করা তাদের শাসনের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল। এ জন্যে কোম্পানী জমিদার বা অর্থলগ্নিকারী ব্যক্তির সাথে ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্যে একটি নির্দিষ্ট অংকের বিনিময়ে চুক্তি সম্পাদন করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে এ ব্যবস্থা চালু করে। কোম্পানী যে অংকের টাকা ধার্য করে দিত তা যে কোন প্রকারে হোক পরিশোধ করার দায়িত্ব থাকত মধ্যস্বত্বভোগীর উপর। মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রজাদের নিকট হতে ভূমি রাজস্ব এভাবে আদায় করত যাতে করে কোম্পানীর দেয় অর্থ পরিশোধ করে তাদের লাভ থাকত। কোম্পানী অধিকহারে রাজস্ব পাওয়ার জন্যে অস্থায়ীভাবে মধ্যস্বত্বভোগীর সাথে বন্দোবস্ত করে এবং প্রয়োজনবোধে একজনকে পরিবর্তন করে অপর জনের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর পূর্ব পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরে পর হতে শুরু করে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভ ও বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত জমিদার ও মহাজনের দৌরাত্ম্য ভূমি চাষী ও প্রজাদের জীবনে অশেষ দুর্ভোগ নিয়ে আসে।। স্মর্তব্য যে, বাংলার ভূমি চাষী প্রায় সবাই ছিল মুসলমান এবং জমিদারি গিয়েছিল অমুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের হাতে।

রাজশাহী জেলার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত এবং বিশেষ করে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহীতে রাণী ভবানীর জমিদারি ছিল। রাণী প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁর সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে দূর্নীতিপরায়ণ গোমস্তা ও কর্মচারিগণ রায়ত থেকে ঠিকমত খাজনা আদায় করে কোম্পানীর কোষাগারে দেয় অর্থ পরিশোধ না করায় রাণীর জমিদারি ক্রমান্বয়ে লাটে উঠে এবং রাজশাহীর জমিদারি রাজা রামকৃষ্ণের উপর কোম্পানী কর্তৃক বন্দোবস্তের ভিত্তিতে অর্পিত হয়। রাজা এ ব্যাপারে রাণী ভবানীর চেয়ে সাফল্য অর্জন করেন এবং কোম্পানী তার অর্থ যোগানের উপর সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু পরে তিনি তা ধরে রাখতে পারেননি।

সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহীতে দু'একজন বাদে যারা জমিদারি লাভ করেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। অপরপক্ষে ভূমি চাষী ছিল প্রায় সবাই মুসলমান। ভূমি চাষী ও প্রজাদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কৃষিজীবী, মহাজন এবং জমিদারদের অণ্ন চাহিদা ও খাজনা মিটাতে প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল। জমিদারগণ প্রজাদের স্বার্থ দেখার চেয়ে প্রথমে কোম্পানী এবং পরে বৃটিশ প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে অধিক তৎপর ছিলেন। ভূমি চাষীদের স্বার্থে তারা প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন ও বিলাসবহুল জীবন-যাপন করেছেন, অথচ প্রজারা জীবনের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা থেকে ছিল বঞ্চিত। কিন্তু দেশ বিভাগের পর শিক্ষা বিস্তারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং তারা বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে পায়। আজকের রাজশাহী তার মূর্ত প্রমাণ।

সংস্কৃতি ও লোকাচার

ইংরেজী 'কালচারের' বাংলা প্রতিশব্দ সংস্কৃতি। মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা ও গুণ আছে তা কর্ষণ ও লালনের ফলে যখন মার্জিত অবস্থায় বিকশিত হয় তখন তাকে সংস্কৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। কালচার বা সংস্কৃতির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে মার্জিত রুচি ও আচরণের প্রশ্ন। তাই সংস্কৃতি বলতে ব্যাপকভাবে মানুষের জীবনযাত্রার ধারা, ধর্ম, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান এবং তার বাঁচার ও জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য যাবতীয় উপকরণ ও দ্রব্য। গ্রাম্য জীবনযাত্রাকে লোক সমাজ এবং শহরের জীবন যাত্রাকে নাগর সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দুই ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি লোক-সংস্কৃতি এবং অপরটি নগর-সংস্কৃতি। অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিল থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে লোক-সংস্কৃতি ও নগর-সংস্কৃতির মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আধুনিককালে চিন্তাধারার বিকাশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ক্রমান্বয়ে লোক- সংস্কৃতি ও নগর-সংস্কৃতির পার্থক্য ক্ষীণ হয়ে আসছে। সংস্কৃতির কোন একটি বিশেষ অংশ বা একটি বিশেষ আচরণ যখন ব্যাপকতা লাভ করে এবং গণমানসে নাড়া দেয় তখন তা লোকাচারের পর্যায়ভুক্ত হয়। সংস্কৃতি ও লোকাচারের দ্বিবিধ ধাপে গড়ে ওঠে লোক-সাহিত্য। পূর্বে বলা হয়েছে যে, রাজশাহী জেলাতে মুসলিম শাসন যুগ থেকে মুসলমানদের যে সংখ্যাধিক্য চলে আসছিল তা বৃটিশ আমলে হ্রাস পায়নি, বরং পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে তা বেড়ে বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা সাতানব্বইয়ের কম হবে না। রাজশাহীর এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানদের সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিকাশলাভ করেছে। মুসলমানদের পর আসে হিন্দু জনগোষ্ঠী, এবং তারপর সাঁওতাল, রাজবংশী ও ওঁরাও জাতীয়লোক রাজশাহীতে বাস করে। এদের প্রত্যেকের সংস্কৃতির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। মুসলিম সংস্কৃতি আল্লাহ্‌র তাওহীদ কেন্দ্রিক হয়ে গড়ে ওঠে এবং হিন্দু ও অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি দেব-দেবীর অর্চনা ও প্রকৃতি-পূজাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাজশাহীর জাতি ভিত্তিক সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ এর ব্যতিক্রম নয়। মুসলমানরা প্রতিটি শুভ কাজ শুরু করার পূর্বে

'বিসমিল্লাহ' বলে থাকে। অপরপক্ষে হিন্দু, সাঁওতাল, রাজবংশী ও ওঁরাও তাদের স্ব-স্ব আরাধ্যের নাম নিয়ে কাজ শুরু করে। নতুন ঘরে মুসলমানরা মিলাদ দিয়ে অথবা কুরআনখানী করে প্রবেশ করে, অপর পক্ষে ধানদুর্বা দিয়ে শিব-দুর্গার নাম দিয়ে হিন্দুরা নতুন ঘরে প্রবেশ করে। মুসলমানরা তাঁদের ধর্মীয় গুরত্বপূর্ণ দিনগুলোতে কুরআন হাদীসের আলোচনা করে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু হিন্দুরা তাদের পূজা অর্চনার দিনগুলো নাচ, গান, কৌতুক এবং এই জাতীয় চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকে। অনুরূপভাবে সাঁওতাল নাচ রাজশাহীর সাঁওতাল সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। উপরন্তু বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দু মেয়েরা ঘরের মেঝেতে, দেওয়ালে বা উঠানে রেখা চিত্রের মাধ্যমে অলপনা এঁকে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের গৃহেও এরূপ রেখা চিত্রের আলপনা দেখা যায়। বিশেষ করে বিয়ে উৎসবে এ জাতীয় সাজসজ্জা লক্ষ্য করা যায়। বিয়ের পূর্বে বর-কনের গায়ে হলুদ দেয়ার রীতি রাজশাহীর মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এ উৎসবে দু'পক্ষের প্রচুর খরচ হয়ে থাকে। রাজশাহীতে মুসলমানদের মধ্যে ছেলের খাত্‌না উৎসব খুব ধুমধামের সাথে পালিত হয়। ছেলেমেয়ের আকীকাও তারা এত গুরুত্ব সহকারে পালন করে না।

বছরে দু'ঈদের দিন মুসলমানদের জন্যে নির্মল আনন্দের উৎসব। একটি রমযানের রোযার শেষে ঈদুল ফিতর এবং অপরটি জুলহাজ্জ মাসে ঈদুল আযহা। রাজশাহীর মুসলমানরা অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে এ দুইটি দিন পালন করে থাকে এবং আত্মীয়-স্বজন নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রতি বছর মুহাররম মাসের দশ তারিখ বা আশুরার দিন ধর্মভীরু মুসলমানরা দিনে রোজা এবং রাতে ইবাদত করেন। এই দিনে শিয়া মুসলমানরা তাজিয়া তোলে এবং হায় হোসেন হায় হোসেন বলে মাতম করে। রাজশাহীতে শিয়া মুসলমান না থাকলেও সুন্নি মুসলমানের কিছু অংশ এখনও তাজিয়া তোলে এবং মাতম করে। এই মুহাররম উৎসবে লাঠি খেলা হয়ে তাকে।

রাজশাহীতে বেশ কিছু লোক-সঙ্গীত চালু আছে। এসব লোক-সঙ্গীতে যেমন সাহিত্যের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি সেসব লোকাচারের উপরও আলোকপাত করে। সারিগান, জারিগান ও গম্ভীরা গান রাজশাহী জেলায় খুব

জনপ্রিয়। গম্ভীরা গান রাজশাহী জেলা ছাড়া অন্য কোন জেলায় গাইতে দেখা যায় না। এটি রাজশাহী জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মাঠে জমি কর্ষণের সময় অথবা ধান পাট নিড়ানোর বা কাটা, ছাদ পেটানো প্রভৃতি কর্মের তালে তালে অথবা নৌকা বাইচের সময় চাষী, শ্রমিক এবং মাঝিমাল্লারা সমবেত কণ্ঠে সেসব গান গেয়ে থাকে সেগুলো সাধারণত সারিগান হিসেবে পরিচিত। রাজশাহীতে সারিগানের প্রচলন আছে। রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলে জারিগান বেশ জনপ্রিয় লাভ করেছে। কারবালার মর্মস্পর্শী কাহিনী নিয়ে জারিগান রচিত হয়। মুহাররমের সময় ইমাম হুসাইন সম্পর্কিত জারিগান সমূহ রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে বেশ উদ্দীপনা সহ গাওয়া হয়ে থাকে। জারিগানে একজন প্রধান গায়েন থাকে যাকে বয়াতী বলা হয় এবং তার সঙ্গীরা সাধারণত দোহার নামে পরিচিত। পরবর্তীতে মুহাররম সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ছাড়াও রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে জারিগানের সুরে রচিত এবং গীত গানকেও জারিগান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

রাজশাহী জেলার ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অতি জনপ্রিয় লোক সঙ্গীত গম্ভীরা গান। নাচ-গান এবং নানা-নাতির কৌতুকভিনয়ের মাধ্যমে গানে সমসাময়িক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হয় এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে দোষ ত্রুটি তুলে ধরা হয়। এ গানের মূল উদ্দেশ্য হলো সত্য ঘটনা তুলে ধরা। গম্ভীরা গানের উস্তাদ বা প্রবর্তনকারী শেখ সফিউর রহমান যিনি সূফী মাস্টার নামে খ্যাত তিনি ১৮৮৮ সালে পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার ফুলবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারত বিভাগের পর তিনি নবাবগঞ্জের রহনপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। গম্ভীরা গানের জন্য সূফী মাষ্টার বিভিন্ন সংস্থা থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। গম্ভীরা গানের উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের কুতবুল আলম ও রকিবুদ্দীন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এ ছাড়াও রাজশাহীতে কবিগান, হাপুগান ও জাগগান প্রচলিত আছে এবং এগুলোর মধ্যে লোকাচারের প্রচুর তথ্য ও উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা রাজশাহীর সংস্কৃতি ও লোকাচার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি, এবং রাজশাহীর সাহিত্য ও ইতিহাসের ধারার পুনর্গঠনে তা অনুসন্ধিৎসু মন

ও গবেষকদের নতুন তথ্যের উদ্‌ঘাটনের জন্যে উৎসাহিত করবে বলে আমরা আস্থাভাজন।

William Adam. *Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar* (Calcutta : Home Secretariat Press.1868).

L. S. S. O'Malley. *Bengal District Gazetteers :Rajashahi* (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot. 1916).

W. W. Hunter. *A Statistical Account of Bengal* (Delhi : D. K. Publishing House. Reprint. 1974).

R. C. Rajumdar. *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century* (Calcutta: Farma K. L. Mukhopadhyay. 1960).

M. Martin. *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Easten India* (Delhi : Cosmo Publication. Reprint. 1976).

S.A. Akanda (ed). *The District of Rajashahi : Its Past and Present* (Rajshahi :The Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi University. 1983).

কালী নাথ চৌধুরী, রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (হুগলী, ১৯০১)

কাজী মোহাম্মদ মিছের, রাজশাহীর ইতিহাস (রাজশাহী, ১৯৬৫)

রাজশাহী পরিচিতি (রাজশাহী বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। আল্লাহ্ পাকের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী (সা)-এর প্রদর্শিত পথে চলে মুসলমানরা বিজয়ীবেশে ও প্রচারক হিসেবে আরবের গন্ডি পেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, এবং ইসলামের আবির্ভাবের এক শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা প্রায় অর্ধগোলার্ধে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কুরআন ও হাদীসকে জীবনবোধের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করে মুসলমানগণ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির রূপরেখা দাঁড় করিয়েছিলেন এবং সে অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে আরবের মুসলমানগণ দেশ জয় ও ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন। উমাইয়া শাসনামল পর্যন্ত এই অবস্থা চলে আসছিল। এরপর পারস্য ও তুর্কী মুসলমানগণ দেশ বিজয় ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তুর্কী বিজয় এই ভারত উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে মুসলিম সমাজ ও শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কীবীর গাযী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশ জয় করে এ দেশে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্র ও উৎস পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে অষ্টম ও নবম শতাব্দী হতে আরব ও পারস্যের মুসলমানগণ ব্যবসা ও ইসলাম প্রচার মানসে সমুদ্রপথ ধরে বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে এসে পৌছেছেন এবং তাঁদরে মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে সেখানে বসতি স্থাপন করেছেন। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলার পুরা ও মধ্য ভূমিতে মুসলমানদের আগমন সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা না দেয়া গেলেও রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার হতে

আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদের ১৭২ হিজরী/৭৮৮ খৃষ্টব্দের আবিষ্কৃত দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রার সূত্রে বলা যায় যে, এই অঞ্চলেও অষ্টম শতাব্দীতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সূফী-দরবেশের পদার্পণ ঘটেছে। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচারক ও সূফী-সাধকগণ এ দেশের নির্যাতিত মানুষকে তাঁদরে সুমধুর ব্যবহার ও আচরণের দ্বারা ইসলামের দিকে আকর্ষণ করেছেন। দেশ বিজয়ের পর মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে বাংলার সুলতানগণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্যে উলামা, মাশায়েক ও সূফী-সাধকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। তুর্কী বিজয়ের পর মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সামজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল তাতে রাজশাহী জেলার স্থানসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রাজশাহী জেলায় অন্তত দু'টি ইকতা বা প্রশাসনিক ইউনিট গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই বাংলার মুসলিম ইতিহাসে রাজশাহীর গুরুত্ব অপরিসীম।

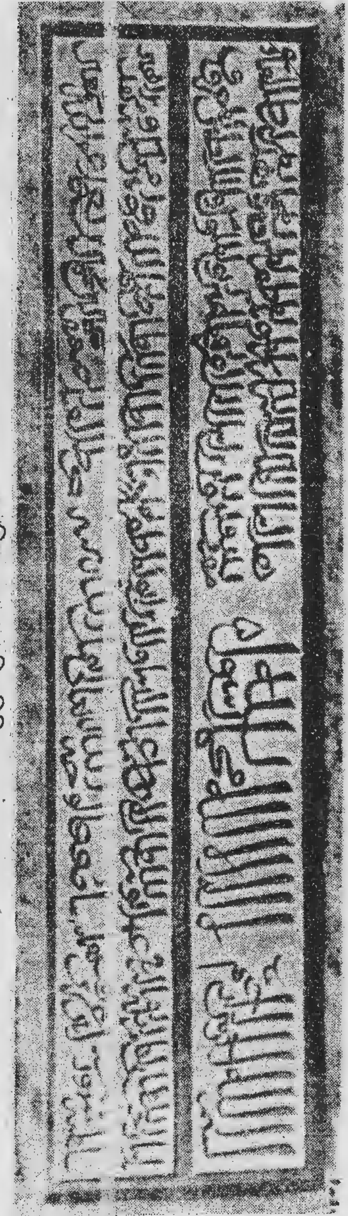
বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে রাজশাহী জেলার অবস্থান। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার ইতিহাসে রাজশাহী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে পাল ও সেন আমলে রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে শাসকদের প্রশাসনিক শহর ও নগর গড়ে উঠেছিল। রাজশাহীর প্রত্নতাত্ত্বিকস্থল অনুসন্ধান করলে এর সত্যতা স্বীকার করতে হয়। এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পর আসে মুসলিম শাসন আমল । ১২০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম শাসনের এই দীর্ঘ সময়ে রাজশাহী প্রশাসনিক দিক থেকে বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই সময়ে রাজশাহীতে গড়ে ওঠা মুসলমানদরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, ইসলাম প্রচার এবং মুসলিম সমাজ গঠনের জন্যে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তার সুফল জনগণ অবশ্যই ভোগ করেছিল। সে সময়ে রাজশাহীতে গড়ে ওঠা মাদ্রাসা বা উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৭৫৭ সাল থেকে বৃটিশ শাসন শুরু হলে রাজশাহীর অতীত ঐতিহ্য একেবারে ম্লান হয়ে যায়নি। বরং শিক্ষার

ক্ষেত্রে রাজশাহী উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান আমলে রাজশাহীর গুরুত্ব সর্বোতভাবে বেড়ে যায়। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১ থেকে) রাজশাহীর উন্নয়ন ও অগ্রগতি পূর্বের চেয়ে অনেকাংশে অধিক সাধিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও রাজশাহীর সার্বিক উন্নয়নের জন্যে ব্যাপক কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত প্রয়োজন।

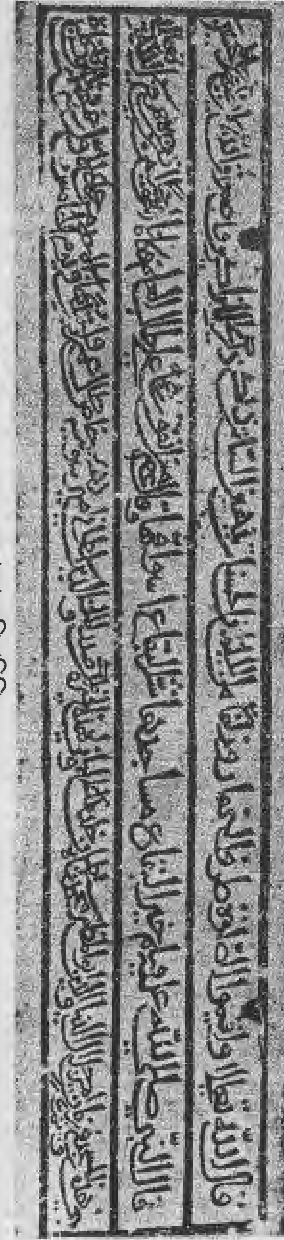
উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের মধ্যে রাজশাহী বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ইসলাম প্রচারের জন্যে রাজশাহীর পরিবেশ প্রতিকূল অবস্থায় নেই। তবে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই জেলার আলিম ও ইসলামী অভিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের সচেষ্ট হতে হবে। ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ দানের হাত প্রসারিত করে ইসলামের জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে এলে সাধারণ ও দুস্থ লোকেরা উপকৃত হবে এবং ইসলামের জীবন-বিধানের দিকে তারা আকৃষ্ট হবে। বিদেশীদের যেমন ধর্ম প্রচারের জন্যে মিশন আছে তেমনি মুসলিম দাতা দেশসমূহের সহায়তায় এবং স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদানে স্থানীয়ভাবে ইসলাম প্রচার মিশন গড়ে তুলে রাজশাহী জেলার দুস্থ উপজাতীয় লোকদের সাহায্য দিয়ে ও পুনর্বাসন করে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে। রাজশাহী জেলার মুসলিম ঐতিহ্যের যেসব স্থাপত্যকীর্তি ও মসজিদ-মাদ্রাসার নির্দশন বিদ্যামান আছে, সে গুলোর যথাযথ সংরক্ষণ করে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সচেতনতা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব সরকার ও জনগণের । ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির প্রয়োজন। দেশপ্রেম না থাকলে একটি জাতির উন্নতি হতে পারে না। তাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে এবং যে কোন ত্যাগ স্বীকার করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। পরিশেষে রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে প্রচেষ্টা পূর্বে আলিম, মাশায়েখ সূফী-সাধক এবং মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল সে ধারার পুনর্জীবন ও তাকে অব্যাহত রাখা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপ-অধ্যায়ে এ জেলার ইসলামী সংগঠনের উপর আলোচনা পেশ করা হয়েছে। 'নূর আল-ইমান সমাজ'

ও 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' উনবিংশ শতাব্দীর দুইটি উল্লেখযোগ্য ইসলামী সংগঠন এবং এ দুইটির কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামী সংগঠনের মধ্যে অন্যতম। উক্ত উপ–অধ্যায়ে এটির কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই সংগঠনের কর্মসূচী ও কার্যক্রম অতি ব্যাপক। সেমিনার ও সভা সমিতির মাধ্যমে জনগণকে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করা এর প্রধান লক্ষ্য। উপরন্তু রাজশাহীর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান অথবা শাখা অফিসের সাথে যে লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার আছে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ইসলামী অভিজ্ঞান ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেসব গ্রন্থ আছে তা পাঠে যে কেউ উপকৃত হতে পারে। রাজশাহীর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতায় ইমাম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর বহু ইমাম ধর্মীয় অভিজ্ঞান ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন। রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ অঞ্চলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বর্ধিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ইসলামী মিশন হাসপাতাল রয়েছে। দরিদ্র ও অভাবী লোক এখান থেকে বিনা খরচে চিকিৎসা লাভ করে থাকে । এটি নিঃসন্দেহে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। পরিশেষে বলা যায় যে, জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং কল্যাণমুখী কর্ম সম্পাদন করতে এসব সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রাজশাহীর জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।



ওয়ারিস কেওতাপাড়া শিলালিপি



সুলতানগঞ্জ শিলালিপি



রুকনউদ্দীন বারবক শাহ ও আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ আমলের মুদ্রা



রুকনউদ্দীন বারবক শাহ ও আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ আমলের মুদ্রা

গ্রন্থপঞ্জি

A. Chronicles

'Afif, Shams Siraj — *Tarikh-i-Firuz Shahi*, Calcutta : Asiatic Society of Bengal, 1890.

'Allami, Abul Fadl — *Ain-i-Akbari* (vol. I), Tr. H. Blochmann, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1873 (vols. II & III), Tr. H.S. Jarret, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1891 & 1894 respectively.

Bakhshi, Nizam ud Din Ahmad — *Tabaqat-i-Akbari* (vol. I), Tr. H. Beveridge, Calcutta : Royal Asiatic Society of Bengal, 1927 (vol. II), Tr. B. De, Calcutta : Royal Asiatic Society of Bengal, 1936 (vol. III), Tr. B. De & Benuprasad, Calcutta : Royal Asiatic Society of Bengal, 1939.

Barani, Zia ud-Din — *Tarikh-i-Firuz Shahi* (Text ed.), Sayyid Ahmad Khan, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1862.

Salim, Ghulam Husain — *Riyad al-Salatin*, Tr. Abdus Salam, Calcutta : Asiatic Society of Bengal, 1904.

Siraj, Minhaj ud-Din Uthman — *Tabaqat-i-Nasiri* (Text ed.) Abdul Hai Habibi, Kabul: Historical Society of Afghanistan, 2nd edition , 1963 ; Tr. Major Raverty, London : Gilbert and Rivington, 1881; New Delhi, Reprint, 1970.

Shu'yab, Shah — *Manaqib al-Asfiya*, extract printed at the end of *Maktubat-i-Sadi*, Bihar, 1286 A. H.

B. Coins and Epigraphs

Ahmad, Qadi — *Gulistan-i-Hunr.* Eng. Tr. entitled *Calligraphers and Painters,* T. Minorsky, Washington: Freer Gallery of Art, 1959.

Ahmad, S. — *Inscriptions of Bengal* (vol. IV) Rajshahi: Varendra Research Museum, 1960.

Ali, A.K. M. Yaqub — *Select Arabic and Persian Epigraphs,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh,1988.

Botham, A. W. — *Catalogue of the Provincial Coin Cabinet, Assam,.* Allahabad : Government Printing Press, 1930.

Dani, A. H. — *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal,* Dhaka : Asiatic Society of Pakistan, 1957.

Khan, Abid Ali — *Memoirs of Gaur and Pandua,* ed. H. E. Stapleton, Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1930.

Karim, A. — *Corpus of the Muslim Coins of Bengal* (down to 1538 A. D.), Dhaka : Asiatic Society of Pakistan, 1960.

,, — *Catalogue of the Coins in the Cabinet of the Chittagong University Museum, Chottagong* Chittagong University Museum, 1979.

Lane Poole, S. — *The Coins of the Mughal Emperors of Hindustan in the British Museum,* London, Trustees of the Museum, 1892.

Raven Shaw, J. H. — *Gaur: Its Ruins and Inscriptions,* London, 1878.

Wright, H. N. — *Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta,* (vol. II), London : Oxford University Press, 1907.

C. English Works

Adam, William — *Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar,* Calcutta : Home Secretariat Press, 1868.

Ali, A. K. M. Yaqub — *Aspects of Society and Culture of the Barind, 1200-1576,* (Ph. D. Thesis, in the press for publication by Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka)

" — *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1983.

Akanda, S. A. (ed.) — *The District of Rajshahi : Its Past and Present,* Rajshahi : The Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1983.

Arnold, T. W. — *The Preaching of Islam,* Lahore : Shaikh Muhammad Ashraf, Reprint, 1956.

Brown, Percy — *Indian Architecture* (Islamic Period), Bombay : D. B. Taraporevala Sons and Co., 1942.

Creswell, K. A. C. — *A Short Account of Early Muslim Architecture,* London : Penguin Books, 1958.

Cunningham, Alexander — *Archaeological Survey Report* (vol. xv), Calcutta : Government Printing Press, 1882.

Dani, A. H. — *Muslim Architecture in Bengal,* Dhaka : Asiatic Society of Pakistan, 1961.

Elliot, H. M. & Dowson, J. — *The History of India as told by its own Historians* (vol. III), Allahabad: Kitab Mahal Private Ltd. n. d.

Fazli Rabbi, K. — *The Origin of the Musalmans of Bengal,* Calcutta, 1895.

Hasan, Mahmud — *Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal,* Dhaka : Dhaka University Press Limited, 1979.

Haq, Enamul — *A History of Sufiism in Bengal,* Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1975.

James, David — *Islamic Art,* London : Hamlyan Publishing Group Ltd. 1974.

Hunter, W. W. — *Statistical Account of Bengal* (vol. III) *Rajshahi & Bogra,* London :Trubner & Co., 1876 ; Reprint, Delhi 1974.

,, — *Indian Musalmans,* London , 1871.

,, — *Annals of Rural Bengal,* London,1897.

Karim, A. — *Social History of the Muslims in Bengal* (down to 1538 A. D.), Dhaka : Asiatic Society of Pakistan, 1959.

Law, N.N. — *The Promotion of Learning in India,* Londan : Longmans Green & Co., 1916.

Majumdar, R. C. — *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century,* Calcutta : Firma K. L., Mukhopadhyay, 1960.

,, — *The History of Bengal* (vol. I)., Dhaka : The University of Dhaka, 1943.

Mallick, A. R. — *British Policy and the Muslims in Bengal* (1757-1856), Dhaka : Bangla Academy, 2nd edition, 1977.

Majumdar, N. G. — *Inscriptions of Bengal* (vol. III), Rajshahi : The Verendra Research Society, 1929.

Martin, M. — *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India,.* Delhi : Cosmo Publication, Reprint, 1976,

Nathan, Mirza — *Bahristan-i-Ghaybi,* Tr. M. I. Borah, Gauhati : The Historical Antiquarian Studies, Government of Assam, 1936.

Paul, Pramode Lal — *The Early History of Bengal* (vol. I) , Calcutta : The Indian Research Institute, 1939.

Rahim, A — *Social and Cultural History of Bengal* (vol. I), Karachi : Pakistan Historical Society, 1963.

Sarker, J. N. (ed.) — *The History of Bengal* (vol. II), Dhaka : The University of Dhaka, 2nd Impression, 1972.

Sen, Benoy Chandra — *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal,* Calcutta : University of Calcutta, 1942

Sen, Prabhash Chandra — *Mahastan and its Environs,* Rajshahi : The Varendra Research Society, 1929.

Sinha, J. C. — *Economic Annals of Bengal,* Londan, 1927.

Stark, H. A. — *Vernacular Education in Bengal (1813-1912),* Calcutta, 1916.

Tarafdar, H. R. — *Husain Shahi Bengal,* Dhaka : Asiatic Society of Pakistan, 1965.

Ziauddin, M. — *Moslem Calligraphy,* Calcutta: Visva Bharati Book Shop, 1936.

D. Bengali Works

আলী, এ. কে. এম. ইয়াকুব — *মুসলিম স্থাপত্য,* ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮১।

,, — *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প,* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

আবু তালিব, মোহাম্মদ — *উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা,* রাজশাহী, ১৯৭৫।

,, — *হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (র)–এর জীবনেতিহাস,* ঢাকা ঃ পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ১৯৬৯।

করিম, আবদুল — *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

কুন্ডু, হরগোপাল দাস — *পুন্ড্রবর্ধন ও করতোয়া,* শেরপুর (বগুড়া), ১৩২৬ বাংলা।

খান, আকরাম — *মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস,* ঢাকা ঃ আজাদ অফিস, ১৯৬৫।

চৌধুরী, কালীনাথ	*রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, হুগলী, ১৯০১।
চন্দ, রম প্রসাদ	*গৌড় রাজমালা*, রাজশাহী ঃ বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৩১৯ বাংলা।
চক্রবর্তী, রজনীকান্ত	*গৌড়ের ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খন্ড, রংপুর ঃ সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৭ বাংলা (১ম খন্ড) ; মালদহ, ১৯০৯ (২য় খণ্ড)।
চক্রবর্তী, যাদব চন্দ্র	*কুলশাস্ত্র দীপিকা*, কলিকাতা ঃ হরিমোহন লাইব্রেরী, ১৩১৪ বাংলা।
জামান, হাসান (সম্পাদিত)	*শতাব্দী পরিক্রমা*, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪।
পন্ডিত, রামাই	*শূন্য পুরান* (নগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত), কলিকাতা ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪ বাংলা।
ব্যানার্জি, রাখাল দাস	*বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খন্ড, কলিকাতা ঃ নব্য ভারত পাবলিশার্স, রিপ্রিন্ট, ১৯৭৪।
মউদুদ, আবদুল	*মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবস্তান, ১৯৬৯।
মজুমদার, মহিম চন্দ্র	*গৌড়ে ব্রাহ্মণ*, কলিকাতা, ১৮৮৫।
মুখপাধ্যায়, সুখময়	*বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর*, কলিকাতা ঃ ভারতী বুক ষ্টল, ১৯৬৬।
মিছের, কাজী মোহাম্মদ	*রাজশাহীর ইতিহাস*, রাজশাহী, ১৯৬৫।
মৈত্র, বিমলাচরণ	*পুঠিয়া রাজবংশ*, কলিকাতা ঃ বঙ্কিম চন্দ্র মৈত্র, ১৩৫৭ বাংলা।
	রাজশাহী পরিচিতি (সম্পাদিত), রাজশাহী ঃ বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০।
রায়, নিহার রঞ্জন	*বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব), কলিকাতা ঃ বুক ইমপরিয়ম, ১৩৩৬ বাংলা।
রায়, নৃত্য গোপাল (সম্পাদিত)	*বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজ*, রাজশাহী, ১৩১১ বাংলা।
শহীদুল্লাহ্, মুহাম্মদ	*বাংলা সাহিত্যের কথা* (২য় খন্ড), ঢাকা ঃ রেনেসাঁ প্রিন্টার্স, ১৯৬৫।
সাহা, রাধা রমন	*পাবনা জেলার ইতিহাস*, পাবনা, ১৩৩৬ বাংলা।
সাত্তার, আবদুল	*তারীখ মাদ্রাসা আলীয়া*, বাংলা অনুবাদ মোস্তাফা হারুন ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০।
"	*আরণ্য জনপদ*, ঢাকা ঃ জলী বুকস, ১৯৬৬।
হক, মুহম্মদ এনামুল	*পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকাঃ আদিল ব্রাদার্স ১৯৪৮।
হক, ফজলুল	*মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

E. District Gazetteers and Journals

District Gazetteers : *Rajshahi , Bogra, Pabna, Dinajpur, Rangpur.*

Journals : *Journal of the Royal Asiatic Society,*London ; *Journal of the Asiatic Society of Bengal* , Calcutta ; *Journal of the Asiatic Society of Pakistan* , Dhaka; *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* Dhaka ; *Bengal : Past and Present,* Calcutta ; *Indian Historical Quarterly,* Calcutta ; *Calcutta Review ; Indian Culture,* Calcutta ; *Journal of the Verandra Research Museum,* Rajshahi University ; *Rajshahi University Studies ; Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Rajshahi University ; *Islamic Culture,* Hydrabad, India ; *Islamic Studies,* Islamabad, Pakistan .

ইতিহাস ঃ ইতিহাস পরিষদ জার্নাল, ঢাকা ; *সাহিত্য পত্রিকা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* ঢাকা ।

নির্ঘন্ট



ই ফা বা নং –৯২–গ/৫৩৪৬ (উ)–২২৫০